দ্বীনের দাওয়াত
আবদুল হামীদ ফাইযী

সূচীপত্র

ভূমিকা
দাওয়াতী কাজের মাহাত্ম্য ১
সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধাদানের বিশেষ গুরুত্ব ৫
মুনকার কাকে বলে? ১৪
সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান করার পর্যায়ক্রম ১৫
সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান এবং জিহাদ ২১
মহানবী ﷺ-এর মন্দ কাজে বাধা দানের কিছু নমুনা ২১
দাওয়াতের উপকারিতা ২৩
ইল্মের হাতিয়ার ২৩
ইখলাস ২৭
নেক আমল ৪০
আদর্শবত্তা ৪২
সার্থক দাঈর গুণাবলী ৪৬
তাক্বওয়া ৪৬
সচ্চরিত্রতা ৪৮
আশাবাদিতা ৬২
হিকমত অবলম্বন ৬৪
ধৈর্যশীলতা ৭৩
আল্লাহর ওয়াস্তে প্রীতি ও বিদ্বেষ ৭৯
বর্তমান পরিস্থিতির ধারণা ৮২
দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না---এই ধারণা প্রবল হলেও
দাওয়াত দিতে হবে ৮৪
ফললাভে শীঘ্রতা ৮৯
দাওয়াত অগ্রাহ্য হলে রাগ ও আফসোস না করা ৯৩
দাওয়াতের উদ্দেশ্য ৯৯
দাওয়াতের পদ্ধতি ১০৩
নিজের আত্মীয়-স্বজন দিয়ে শুরু করতে হবে ১০৬
মর্যাদাবানের মর্যাদা রক্ষা ক'রে গোপনে দাওয়াত দেওয়া ১০৭
অতিরঞ্জন ১০৮
দাওয়াতের নানা মাধ্যম ১১০
আবেগময় বয়ান ১১৭
দাওয়াতের সুযোগ গ্রহণ ১১৯
মহিলার দাওয়াত ১২২
দাওয়াতের জন্য সংগঠন ১২৫

আব্দুল হামীদ মাদানী

ভূমিকা

মহান আল্লাহর দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহবান করার দায়িত্ব প্রত্যেক মুসলিমের। এ কাজ কেবল আলেমদের নয়। তবে আলেমদের দায়িত্ব বেশী। আল্লাহ যাঁদেরকে তাওফীক দেন, তাঁরা দ্বীনের দাওয়াতের কাজ ক'রে থাকেন।

বর্তমান যুগে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াও নানা সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে দাওয়াতের নানা পথ ও পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। দাওয়াতের ময়দানও বড় প্রশস্ত। আর তাতে নানা তরীকা, নানা বিদআত।

সঠিক দ্বীনের দাওয়াতের কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিতে যাঁরা আগ্রহী, তাঁদেরই জন্য এই পুস্তিকা একটি ছোট্ট উপহার। আল্লাহ চাইলে তাঁরা এর দ্বারা উপকৃত ও অনুপ্রাণিত হবেন---ইন শাআল্লাহ।

এ পুস্তিকায় কোন দল বা জামাআতকে কটাক্ষ করা উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হাদীসে বর্ণিত 'আল-জামাআহ'-এর দাওয়াত-পদ্ধতি বর্ণনা করা। যে জামাআতের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ, তার দাওয়াতী বুনিয়াদও তাওহীদ। তাওহীদ যেন ইসলামের প্রাণ, প্রত্যেক আমলের ভিত্তি এবং প্রত্যেক দাওয়াতের প্রথম ও শেষ।

আমরা সেই তাওহীদের কিশ্তীতে চড়ে নানা ভেজালের বন্যা থেকে বাঁচতে পারি। তাওহীদের পতাকাতলেই আমরা সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হতে পারি। আমরা আমাদের দাওয়াতে সেই তাওহীদের দিকেই সকলকে আহবান জানাই।

আল্লাহ সকলকে তাওফীক দিন। আমীন

বিনীত---

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

২/৩/ ১৪৩২

৫/২/ ১১

দাওয়াতী কাজের মাহাত্ম্য

দাওয়াতী কাজের বড় মাহাত্ম্য রয়েছে ইসলামে। যেহেতু এ কাজ হল মহৎ লোকের কাজ। দাঈ দাওয়াত দেয় সবচেয়ে যিনি বড়, তাঁর দিকে। অতএব তার এ কাজ অবশ্যই বড়। সে নিজ কথা দিয়ে আহবান করে তাঁর দিকে, যিনি আকবার ও আ'যাম, আ'লা ও আজাল্ল। অতএব তার কথা অবশ্যই সবচেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ কথা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি? *(হা-মীম সাজদাহঃ ৩৩)*

দাওয়াত দেওয়ার কাজ সাধ্যানুযায়ী ওয়াজেব। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে দাওয়াত দিতে আদেশ করেছেন। আর সে আদেশ সকল উম্মতের জন্য। নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সকলের জন্য। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত। *(নাহলঃ ১২৫)*

( ) { }

অর্থাৎ, তুমি তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর। নিশ্চয় তুমি সরল পথেই প্রতিষ্ঠিত। *(হাজ্জঃ ৬৭)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত অবতীর্ণ করার পর ওরা যেন তোমাকে কিছুতেই সেগুলি হতে বিমুখ না ক'রে ফেলে। তুমি তোমার প্রতিপালকের দিকে আহবান কর এবং কিছুতেই অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত

হয়ো না। *(ক্বাস্বাসঃ ৮৭)*

দাওয়াতের কাজ আম্বিয়ার কাজ, রসূলগণের বৃত্তি, তাঁদের জীবনই ছিল দাওয়াতী জীবন। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে পরিভ্রমণ ক'রে দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিণাম কী হয়েছে। *(নাহলঃ ৩৬)*

এ মহান কাজ নবীর অনুসারীদেরও। যারা নবীকে নবী বলে মানে এবং মানার মতো মানে, তারা সব কাজে যথাসাধ্য অনুসরণ করে। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি বল, 'এটাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারিগণও। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' *(ইউসুফঃ ১০৮)*

( ) }

( ) {

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! কি আশ্চর্য ! আমি তোমাদের আহবান করছি মুক্তির দিকে; আর তোমরা আমাকে আহবান করছ জাহান্নামের দিকে। তোমরা আমাকে আহবান করছ, যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং এমন কিছুকে তাঁর সমকক্ষ স্থির করি, যার সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নেই, পক্ষান্তরে আমি তোমাদেরকে আহবান করছি পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। *(মু'মিনঃ ৪১-৪২)*

না, সবাই পারবে না। এক এক মানুষের এক এক রকম পেশা, এক এক রকম নেশা।

কাউকে ব্যবসা করতে হবে, আর সেই ব্যবসার ফাঁকেই দাওয়াতের কাজ হবে। তবে ব্যবসা তার পেশা।

কেউ মুজাহিদ হবে, আল্লাহর রাস্তায় বিভিন্ন জিহাদ ও সংগ্রাম করবে। জিহাদই তার পেশা।

কেউ পেশাদার চাষী হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, বিচারপতি হবে, চিকিৎসক হবে, আর পেশার মাঝে সাধ্যানুসারে দাওয়াতী কাজ করবে।

কেউ ফকীহ হবে। দ্বীনী ইল্ম, দর্স-তাদরীস ও ফিক্‌হই হবে তার পেশা। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয় যে, তারা (জিহাদের জন্য) সবাই একত্রে বের হয়ে পড়ে; সুতরাং তাদের প্রত্যেকটি বড় দল হতে এক একটি ছোট দল বহির্গত হয় না কেন, যাতে অবশিষ্ট লোক ধর্মজ্ঞান অর্জন করতে থাকে এবং যাতে তারা নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে এলে তাদেরকে সতর্ক করতে পারে। যাতে তারা সাবধান হতে পারে। *(তাওবাহঃ ১২২)*

ইল্ম অর্জন ক'রে কেউ দাঈ হবে, দাওয়াতের কাজই হবে তার পেশা। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত, যারা (লোককে) কল্যাণের দিকে আহবান করবে এবং সৎকার্যের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কার্য থেকে নিষেধ করবে। আর এ সকল লোকই হবে সফলকাম। *(আলে ইমরানঃ ১০৪)*

যে কাজে আল্লাহর আদেশ, সে কাজের মাহাত্ম্য কি কম বলা যায়?

মহানবী ﷺ খায়বারের দিন আলী বিন আবী তালেব ؓ-কে বলেছিলেন, "তুমি ধীর-স্থিরভাবে যাত্রা ক'রে তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হও। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহবান কর এবং ইসলামে তাদের উপর মহান আল্লাহর কী কী অধিকার এসে বর্তাবে, তা তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটনী (আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ৩৭০১, মুসলিম ২৪০৬নং)*

দাওয়াতের কাজ সফল হলে, তাতে রয়েছে বহুগুণ সওয়াব।

কেউ যদি দাওয়াতের মাধ্যমে একটি বেনামাযীকে নামাযী বানায়, তাহলে দাঈ ঐ নামাযীর নামাযের সওয়াব পাবে।

কেউ যদি দাওয়াতের মাধ্যমে কোন বেরোযাদারকে রোযাদার বানায়, তাহলে দাঈও রোযাদারের রোযা রাখার সওয়াব পাবে।

কেউ যদি দাওয়াতের মাধ্যমে কোন লোককে হাজী বানায়, তাহলে দাঈও হজ্জের সওয়াব পাবে।

অনুরূপ সকল সৎকর্মের ক্ষেত্রে একই বিধান।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহবান করে (দাওয়াত দেয়), সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহবান করে, সেই ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।” *(মুসলিম ২৬৭৪নং প্রমুখ)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে যাচ্ঞা করল। তিনি বললেন, “আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দান করব। তবে তুমি অমুকের নিকট যাও।” সে ঐ লোকটির নিকট গেল। লোকটি তাকে দান করল। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে, তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।” *(ইবনে হিব্বান)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশক কল্যাণ সম্পাদনকারীরই অনুরূপ।” *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১১১নং)*

যে মানুষকে আল্লাহর ওয়াস্তে আল্লাহর দিকে আহবান করবে, তার সওয়াব অবশ্যই অজস্র, অবশ্যই অসংখ্য।

পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করে না, সে শাস্তিযোগ্য অপরাধী হতে পারে। যেহেতু সে সেই আদেশ অমান্য করে, যে আদেশ মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে দিয়েছেন,

{ }

অর্থাৎ, হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। *(মাইদাহঃ ৬৭)*

সে ব্যক্তি ইল্ম গোপন করার অপরাধে জড়িয়ে যেতে পারে, অথচ তার শাস্তি ভয়ানক। মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ,(স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং তারা যা ক্রয় করে, তা কত নিকৃষ্ট। *(আলে ইমরানঃ ১৮৭)*

}

( ) {

অর্থাৎ, আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য স্পষ্টভাবে আমি কিতাবে ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন করে, আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। *(বাক্বারাহঃ ১৫৯)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যাকে ধর্মীয় জ্ঞান বিষয়ক কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হয়, আর সে (যদি উত্তর না দিয়ে) তা গোপন করে, কিয়ামতের দিন তাকে (জাহান্নামের) আগুনের লাগাম পরানো হবে।” *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদানের বিশেষ গুরুত্ব

দ্বীনী দাওয়াতের একটি প্রধান কাজ হল সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান। আর এ কাজের বড় গুরুত্ব রয়েছে ইসলামে। বরং এর এত বড় গুরুত্ব রয়েছে যে, অনেক উলামা একে ইসলামের ষষ্ঠ রুক্ন বলে গণ্য করেছেন।

❁ এ কাজ ঈমানী শক্তিমত্তার দলীল। পক্ষান্তরে এর বিপরীত কাজ মুনাফিক্বীর দলীল। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান,

হিকমতওয়ালা। *(তাওবাহঃ ৭১)*

}

{

অর্থাৎ, মুনাফিক্ব পুরুষেরা এবং মুনাফিক্ব নারীরা এক অপরের অনুরূপ। তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের হাতগুলিকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ ক'রে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিক্বরাই হচ্ছে অতি অবাধ্য। *(ঐঃ ৬৭)*

❁ এ কাজ পৃথিবীর বুকে বিজয় ও প্রতিষ্ঠা লাভের হেতু। মহান আল্লাহ বলেন,

( ) }

( ) {

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে (তাঁর ধর্মকে) সাহায্য করে। আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাশক্তিমান, চরম পরাক্রমশালী। আমি তাদেরকে পৃথিবীতে (রাজ)ক্ষমতা দান করলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং সৎ কার্যের আদেশ দেয় ও অসৎকার্য হতে নিষেধ করে। আর সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর আয়ত্তে। *(হাজ্জঃ ৪০-৪১)*

বলা বাহুল্য, যে রাজ্যে শির্কী কর্মকাণ্ডের মদদ পাওয়া যায়, মদ্যপান ও ব্যবসার অনুমতি পাওয়া যায়, বেশ্যাবৃত্তির অনুমোদন পাওয়া যায়, অবৈধ প্রেম-ভালবাসার সমর্থন পাওয়া যায়, গান-বাজনা ও সূদী কারবারের ছাড়পত্র পাওয়া যায়, সে রাজ্যের বিজয় ও প্রতিষ্ঠা কি আদৌ সম্ভব?

❁ এ কাজ পরিত্রাণের হেতু। আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচার পথ। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল তারা যখন তা বিস্মৃত হল, তখন যারা মন্দ কাজে বাধা দান করত, তাদেরকে আমি উদ্ধার করলাম এবং যারা অত্যাচারী ছিল তারা সত্যত্যাগ করত বলে আমি তাদেরকে কঠোর শাস্তির সাথে পাকড়াও করলাম। *(আ'রাফঃ ১৬৫)*

}

{

অর্থাৎ, যেসব উম্মত তোমাদের পূর্বে গত হয়েছে, আমি যাদেরকে রক্ষা করেছিলাম তাদের মধ্য হতে অল্প কতক ব্যতীত এমন সজ্জন ছিল না, যারা পৃথিবীতে অশান্তি ঘটাতে বাধা প্রদান করত। যালেমরা যে আরাম-আয়েশে ছিল, তার পিছনেই পড়ে রইল। আর তারা ছিল অপরাধী। *(হূদঃ ১১৬)*

❁ এ কাজ বর্জন করলে অভিশাপ ও লা'নতের তর্জন আসে; যেমন এসেছিল বানী ইস্রাঈলের উপরে। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( )

( ) {

অর্থাৎ, বনী ইস্রাঈলের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছিল, তারা দাউদ ও মারয়্যাম-তনয় কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কেননা, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালংঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অন্যকে বারণ করত না। তারা যা করত, নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট। *(মাইদাহঃ ৭৮-৭৯)*

❁ এ মহান কর্ম আম্বিয়াগণের। তাঁদের প্রধান কর্তব্যই ছিল মানুষকে ভাল কাজের আদেশ করা এবং মন্দ কাজে বাধা দেওয়া। মহান আল্লাহ শেষনবী ﷺ প্রসঙ্গে বলেছেন,

}

{

অর্থাৎ, যারা নিরক্ষর রসূল ও নবীর অনুসরণ করে, যার উল্লেখ তওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট আছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়, যে তাদেরকে সৎকাজের নির্দেশ দেয় ও অসৎকাজে নিষেধ করে, যে তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহকে বৈধ করে ও অপবিত্র বস্তুসমূহকে অবৈধ করে এবং যে তাদের ভার ও বন্ধন যা তাদের উপর ছিল (তা হতে) তাদেরকে মুক্ত করে। সুতরাং যারা তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তাকে সম্মান করে, তাকে সাহায্য করে এবং যে আলো তার সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে তার অনুসরণ করে, তারাই হবে সফলকাম। *(আ'রাফ ১৫৭)*

❁ এ মহান কর্ম মু'মিন-মুসলিম উম্মাহর। প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী এ কর্মের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। আর যথাযথভাবে নামায আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে। এসব লোকের প্রতিই আল্লাহ অতি সত্বর করুণা বর্ষণ করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমতাবান, হিকমতওয়ালা। *(তাওবাহঃ ৭১)*

}

( )

( ) {

অর্থাৎ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের প্রাণ ও তাদের ধন-সম্পদসমূহকে বেহেশ্তের বিনিময়ে ক্রয় ক'রে নিয়েছেন; তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, যাতে তারা হত্যা করে এবং নিহত হয়ে যায়। এ (যুদ্ধে)র দরুন (জান্নাত প্রদানের) সত্য অঙ্গীকার করা হয়েছে তাওরাতে, ইঞ্জীলে এবং ক্বুরআনে; আর নিজের অঙ্গীকার পালনে আল্লাহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ করতে থাক তোমাদের এই ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যা তোমরা সম্পাদন করেছ। আর এটা হচ্ছে মহাসাফল্য। তারা হচ্ছে তওবাকারী, ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযা পালনকারী, রুকু ও সিজদাকারী, সৎকাজে আদেশ এবং মন্দ কাজে বাধা প্রদানকারী, আল্লাহর বিধি-সীমাসমূহের সংরক্ষণকারী। আর তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও। *(তাওবাহঃ ১১১-১১২)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "প্রতিটি মানুষই দায়িত্বশীল। সুতরাং প্রত্যেকেই অবশ্যই তার অধীনস্থদের দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। দেশের শাসক জনগণের দায়িত্বশীল। সে তার দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জবাবদিহী করবে। একজন পুরুষ তার পরিবারের দায়িত্বশীল। অতএব সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে। স্ত্রী তার স্বামী ও সন্তানের দায়িত্বশীল। কাজেই সে তার দায়িত্বশীলতার বিষয়ে জিজ্ঞাসিতা হবে।

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। অতএব প্রত্যেকেই নিজ নিজ অধীনস্থের দায়িত্বশীলতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কেউ এ মহান কাজে পিছপা হলে জানতে হবে, তার ঈমান নেই অথবা বড় দুর্বল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী (শিষ্য) ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত, তা করত না এবং তারা তা করত, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে, সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে, সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে, সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম)*

❂ এ কাজের মহান দায়িত্ব পালন করে শ্রেষ্ঠ উম্মত। এ দায়িত্ব পালনের জন্য এ শ্রেষ্ঠ জাতির উদ্ভব হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। *(আলে ইমরানঃ ১১০)*

❂ এ কাজ পরিহার করলে দুআ কবুল হয় না। মহানবী ﷺ বলেন, "তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ আছে! তোমরা অবশ্যই ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে শীঘ্রই আল্লাহ তাআলা তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর কাছে দুআ করবে; কিন্তু তা কবুল করা হবে না।" *(তিরমিযী)*

❂ এ কাজ বর্জন করলে শাস্তির গর্জন আসতে পারে। আর তাতে ভাল-মন্দ সকল লোক একই আযাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রাযিয়াল্লাহহু আনহা) হতে বর্ণিত, একদা নবী ﷺ তাঁর

নিকট শঙ্কিত অবস্থায় প্রবেশ করলেন। তিনি বলছিলেন, "আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, আরবের জন্য ঐ পাপ হেতু সর্বনাশ রয়েছে যা সন্নিকটবর্তী। আজকে ইয়া'জুজ-মা'জুজের দেওয়াল এতটা খুলে দেওয়া হয়েছে।" আর তিনি (তার পরিমাণ দেখানোর জন্য) নিজ বৃদ্ধা ও তর্জনী দুই আঙ্গুল দ্বারা (গোলাকার) বৃত্ত বানালেন। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মাঝে সৎলোক মওজুদ থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, যখন নোংরামি বেশী হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সুতরাং কেউ 'চাচা, আপন জান বাঁচা' বললেও রেহাই পাবে না। 'যে কাঠ খাবে, সে আঙ্গার হাগবে' বলে যে এ নৈতিক দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করবে, তাকেও আঙ্গার হাগতে হবে। যেহেতু

"অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নির্ধারিত সীমায় অবস্থানকারী (সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানকারী) এবং ঐ সীমা লংঘনকারী (উক্ত কাজে তোষামোদকারীর) উপমা হল এক সম্প্রদায়ের মত; যারা একটি দ্বিতলবিশিষ্ট পানি-জাহাজে লটারি করে কিছু লোক উপর তলায় এবং কিছু লোক নিচের তলায় স্থান নিল। (নিচের তলা সাধারণতঃ পানির ভিতরে ডুবে থাকে। তাই পানির প্রয়োজন হলে নিচের তলার লোকদেরকে উপর তলায় যেতে হয় এবং সেখান হতে সমুদ্র বা নদীর পানি তুলে আনতে হয়।) সুতরাং পানির প্রয়োজনে নিচের তলার লোকেরা উপর তলায় যেতে লাগল। (উপর তলার লোকদের উপর পানি পড়লে তারা তাদের উপর ভাগে আসা অপছন্দ করল। তারা বলেই দিল, 'তোমরা নিচে থেকে আমাদেরকে কষ্ট দিতে এসো না।') নিচের তলার লোকেরা বলল, 'আমরা যদি আমাদের ভাগে (নিচের তলায় কোন স্থানে) ছিদ্র ক'রে দিই, তাহলে (দিব্যি আমরা পানি ব্যবহার করতে পারব) আর উপর তলার লোকদেরকে কষ্টও দেব না। (এই পরিকল্পনার পর তারা যখন ছিদ্র করতে শুরু করল) তখন যদি উপর তলার লোকেরা তাদেরকে নিজ ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয় (এবং সে কাজে বাধা না দেয়), তাহলে সকলেই (পানিতে ডুবে) ধ্বংস হয়ে যায়। (উপর তলার লোকেরা সে অন্যায় না করলেও রেহাই পেয়ে যাবে না।) পক্ষান্তরে উপর তলার লোকেরা যদি তাদের হাত ধরে (জাহাজে ছিদ্র করতে) বাধা দেয়, তাহলে তারা নিজেরাও বেঁচে যায় এবং সকলকেই বাঁচিয়ে নেয়।" *(বুখারী)*

'নিজের চরকায় তেল দাও। ঘরের খেয়ে বনের মোষ চরানোর কী

দরকার? আপন বাঁচলে বাবার নাম। চাচা আপন জান বাঁচা। যে কাঠ খাবে সে আঙ্গার হাগবে। যে পাপ করবে, সে তার ফল ভুগবে, তাতে পরের নাক গলানোর দরকার কী?' ইত্যাদি বুলি ঝেড়ে কেউ বাঁচতে পারবে না। যেহেতু অপরকে বাঁচানোর দায়িত্বও তার ঘাড়ে আছে।

আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ বলেন, হে লোক সকল! তোমরা এই আয়াত পড়ছ,

{ }

"হে মু'মিনগণ! তোমাদের আত্মরক্ষা করাই কর্তব্য। তোমরা যদি সৎপথে পরিচালিত হও, তবে যে পথভ্রষ্ট হয়েছে, সে তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" *(সূরা মায়েদাহ ১০৫ আয়াত)* কিন্তু আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যখন লোকেরা অত্যাচারীকে (অত্যাচার করতে) দেখবে এবং তার হাত ধরে না নেবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের সকলকে তাঁর শাস্তির কবলিত করবেন।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ)*

মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ ক'রে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। *(আনফালঃ ২৫)*

❂ এ কাজ সদকাহ করার সমতুল্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রত্যেক (হাড়ের) জোড়ের পক্ষ থেকে প্রাত্যহিক (প্রদেয়) সাদকাহ রয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) সাদকাহ এবং ভাল কাজের আদেশ প্রদান ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ। এ সব কাজের পরিবর্তে চাশ্তের দু'রাক্আত নামায যথেষ্ট হবে।" *(মুসলিম)*

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাদকাহ করা জরুরী।" আবূ মূসা ؓ জিজ্ঞাসা করলেন, 'যদি সে সাদকাহ করার মত কিছু না পায় তাহলে?' তিনি বললেন, "সে তার হাত দ্বারা কাজ করে (পয়সা উপার্জন করবে)। অতঃপর তা থেকে সে নিজে উপকৃত হবে এবং সাদকাও করবে।" পুনরায় আবূ মূসা ؓ বললেন, 'যদি সে তাও না পারে?' তিনি বললেন, "যে কোন অভাবী বিপন্ন মানুষের সাহায্য করবে।"

আবূ মূসা ﷺ বললেন, 'যদি সে তাও না পারে?' তিনি বললেন, "সে মানুষকে ভাল কাজের নির্দেশ দেবে।" আবূ মূসা ﷺ বললেন, 'যদি সে এটাও না পারে?' তিনি বললেন, "সে (অপরের) ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, সেটাও হল সাদকাহ স্বরূপ।" *(বুখারী-মুসলিম)*

❁ এ কাজ পাপের কাফ্‌ফারা স্বরূপ।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মানুষের স্ত্রী, ধন-সম্পদ, নিজের জীবন, সন্তান ও প্রতিবেশী সম্পর্কিত ফিতনার (পাপের) কাফ্‌ফারা হল নামায, রোযা, সাদকাহ এবং সৎকর্মের আদেশ ও অসৎ কর্মে বাধা দান।" *(মুসলিম)*

❁ এ মহান কাজে রয়েছে মহা প্রতিদান। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে কোন কল্যাণ নেই, তবে যে (তার পরামর্শে) দান খয়রাত, সৎকাজ ও মানুষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের নির্দেশ দেয় (তাতে কল্যাণ আছে)। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষায় যে ঐরূপ করবে, তাকে আমি মহা পুরস্কার দান করব। *(নিসাঃ ১১৪)*

❁ এ কাজ ছেড়ে দেওয়া চিকিৎসা না ক'রে সংক্রামক ব্যাধি ছেড়ে রাখার মত। যে ব্যাধি ব্যাধিগ্রস্ত ছাড়া তার ধারেপাশের সুস্থ লোককেও আক্রমণ করে এবং ধীরে ধীরে মহামারীর মত সকলকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

❁ এ মহান কাজে রয়েছে মুসলিমদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতা। আর মহান আল্লাহ ভাল কাজে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, সৎ কাজ ও আত্মসংযমে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে একে অন্যের সাহায্য করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তিদানে অতি কঠোর। *(মাইদাহঃ ২)*

❁ এ কাজ হল নেক লোকেদের, সৎশীল ভাল মানুষদের।

}

( ) {

আপত্তিকর কাজ হতে দেখলেই আপত্তি করা মুসলিমের কাজ। অন্যায়ে প্রতিবাদ করা মু'মিনের কাজ। শাসকের ভয় হলেও, শাসককে শরয়ী

পদ্ধতিতে নসীহত করা ঈমানদার মানুষের কাজ। তারা আল্লাহ ও শেষ দিনে বিশ্বাস রাখে, সৎকার্যের নির্দেশ দেয়, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করে এবং তারা সৎকার্যে তৎপর থাকে। তারাই সজ্জনদের অন্তর্ভুক্ত। *(আলে ইমরানঃ ১১৪)*

উম্মুল মু'মেনীন উম্মে সালামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, "না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায কায়েম করবে।" *(মুসলিম)*

নিন্দুকের নিন্দার ভয় করা মুসলিমের কাজ নয়। সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান করলে লোকে কিছু বলবে, ভাব চটে যাবে, কোন ক্ষতি করবে ইত্যাদি ওজরে সে কাজে পিছপা হওয়া ঈমানদারের গুণ নয়।

উবাদাহ ইবনে স্বামেত ﷺ বলেন, 'আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই মর্মে বাইয়াত করলাম যে, দুঃখে-সুখে, আরামে ও কষ্টে এবং আমাদের উপর (অন্যদেরকে) প্রাধান্য দেওয়ার অবস্থায় আমরা তাঁর পূর্ণ আনুগত্য করব। রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে তার নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার লড়াই করব না; যতক্ষণ না তোমরা (তার মধ্যে) প্রকাশ্য কুফরী দেখ, যে ব্যাপারে তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে দলীল রয়েছে। আর আমরা সর্বদা সত্য কথা বলব এবং আল্লাহর ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করব না।' *(বুখারী-মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান। *(মুসলিম)*

একদা মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাক।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! সে মজলিসে না বসলে তো আমাদের উপায় নেই; আমরা সেখানে কথাবার্তা বলি।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখন তোমরা (সেখানে) না বসে মানবেই না, তখন তোমরা

সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধাদান করার পর্যায়ক্রম

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" *(মুসলিম)*

সুতরাং এ কাজের পর্যায় হল নিম্নরূপ ঃ-

প্রথম পর্যায় ঃ হাত দ্বারা পরিবর্তন।

মন্দ কাজে বাধা দেওয়ার উক্ত শরয়ী পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। "যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখবে....."

অর্থাৎ, প্রথমতঃ জানতে হবে যে, মন্দ কাকে বলে? অর্থাৎ, তা শরীয়তানুসারে মন্দ কি না? তা চূড়ান্তভাবে মন্দ কি না? অর্থাৎ, তাতে আহলে সুন্নাহর উলামা একমত কি না?

যে কাজকে মন্দ বলে তার আপত্তি করা হবে, তা সর্ববাদিসম্মত মন্দ ও আপত্তিকর হতে হবে। নচেৎ বিতর্কিত হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে সঠিক মত উপস্থাপন ক'রে কেবল উপদেশ দেওয়াই উত্তম।

ধরুন, একজনের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। দেখলেন, তার শিশুকন্যা পুতুল নিয়ে খেলা করছে।

অথবা দেখলেন, কেউ দাড়িতে কাল কলপ লাগিয়েছে।

কেউ ক্যামেরায় ছবি তুলছে।

কোন মহিলা চেহারা খুলে আছে।

সন্দিগ্ধ দিনে রোযা অথবা ঈদ করছে।

তাহলে এ ক্ষেত্রে কট্টর হওয়া ঠিক হবে না। বরং উপদেশ দিয়ে সঠিক মত বয়ান ক'রে দেওয়াই উত্তম হবে।

দ্বিতীয়তঃ সেই মন্দ ঘটতে স্বচক্ষে দেখতে হবে, সেই মন্দ বলতে স্বকর্ণে শুনতে হবে অথবা ঘটার কথা সুনিশ্চিতভাবে জানতে হবে। সেই মন্দ প্রকাশ ও স্পষ্ট হতে হবে। নচেৎ আন্দাজে অনুমান ক'রে, কারো প্রতি কুধারণা ক'রে আপত্তিকর কথা বলা ঠিক নয়।

যেমন, কারো মাত্র একটি বা দু'টি বাচ্চা। আপনি ভাবলেন, সে ছেলে

রাস্তার হক আদায় কর।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রাস্তার হক কী?' তিনি বললেন, "দৃষ্টি সংযত করা, কাউকে কষ্ট না দেওয়া, সালামের জবাব দেওয়া, ভাল কাজের নির্দেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মুসলিম যেখানেই থাক, সেখানেই সাধ্যানুযায়ী অন্যায়ের প্রতিবাদ করবে। বাড়িতে অথবা বাইরে, মসজিদে অথবা বাজারে, বাগানে-মাঠে-ঘাটে-পথে সর্বস্থলে সেই মহৎ কাজ অবর্জনীয়।

অন্যায় যেই করুক না---ঘর অথবা পর, বন্ধু অথবা শত্রু, বয়োজ্যেষ্ঠ অথবা বয়োকনিষ্ঠ, গুরু অথবা ছাত্র, নেতা অথবা অনুসারী সকলকেই সেই অন্যায়ে রীতিমত বাধা দিতে হবে। অবশ্যই প্রত্যেকের মর্যাদা খেয়াল রাখতে হবে। সে কথা অন্যত্র আলোচিত হবে।

বাধা দিতে হবে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীকে। যেহেতু এ কাজ কেবল আলেম-উলামার নয়। তবে এ ব্যাপারে আলেম-উলামার দায়িত্বটা বেশী।

মুনকার কাকে বলে?

গর্হিত, আপত্তিকর, খারাপ, মন্দ, অসৎ, নোংরা ইত্যাদি কাজ কাকে বলে?

কারো ব্যক্তিগত মতে কি কোন কাজকে খারাপ বলা যাবে?

কোন সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী বা অন্য কোন শিক্ষিত লোকের মতানুসারে কোন কাজকে ভাল অথবা মন্দ বলা যাবে কি?

কোন কাজ বেশী সংখ্যক লোক করে বলে তা ভাল অথবা মন্দ ধরে নেওয়া যাবে কি?

কোন কাজ গরীব করলে খারাপ এবং ধনী করলে খারাপ নয়---এমন হতে পারে কি?

কোন কাজ আলেম করলে খারাপ এবং সাধারণ লোকে করলে খারাপ নয়---এমন মনে করা যাবে কি?

অবশ্যই না। বরং ভাল ও মন্দের কষ্টিপাথর হল শরীয়ত। শরীয়ত যে বিশ্বাস, কথা ও কাজকে ভাল বলে, তাই ভাল এবং শরীয়ত যে বিশ্বাস, কথা ও কাজকে মন্দ বলে, তাই মন্দ ও আপত্তিকর। ভাল কাজ ওয়াজেব বা উত্তম হতে পারে, আর মন্দ কাজ হারাম বা মকরূহ হতে পারে।

ছোট বা কম মন্দ হলে প্রথমটিতে বাধা দিতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি বাধা দিলে মঙ্গল হয়, তাহলে অবশ্যই বাধা দেওয়া ওয়াজেব। আর তখন এমনভাবে বাধা দিতে হবে, যেন মন্দ অপসৃত হয়, তার বিকল্পে ভাল স্থানলাভ করে, মন্দের দরজা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব দুর্বল হলে অথবা মন্দ দূরীকরণে অসমর্থ হলে যদি এমন কেউ থাকে, যার কাছে অভিযোগ করলে সে ঐ মন্দ শক্তি দ্বারা দূর ক'রে দেবে, তাহলে তাই করা কর্তব্য হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বাড়ির মুরুব্বী বাড়ির লোকের এবং ইসলামী সরকার জনগণের মন্দকর্মে সহজে বাধা দিতে পারে। বাড়ির লোক অসমর্থ হলে তাদের মুরুব্বীর কাছে এবং জনগণ অসমর্থ হলে সরকারের কাছে অভিযোগ জানিয়ে মন্দ অপসারণ করতে পারে।

কিন্তু মন্দ যদি সরকার দ্বারা হয়, তাহলে?

তাহলে তা দূরীকরণের জন্য রাষ্ট্রনেতাকে গোপনে নসীহত করতে হবে।

যাদের মাধ্যমে আপত্তি পৌঁছানো যায়, তাদের মাধ্যমে তা পৌঁছে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে বিক্ষোভ প্রদর্শন বা উত্তাল প্রতিবাদ বা ভাঙচুর ক'রে কোন নাগরিক বা দেশের সম্পত্তি নষ্ট করা বৈধ নয়।

সরকার পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে, তার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

আইনানুগভাবে পার্লামেন্টে অধিক সিট দখল করতে হবে।

অধিকাংশ জনগণকে খাঁটি তওহীদবাদী মুসলিম বানানোর কাজ করতে হবে।

আর সেসব না পারলে অন্তর দ্বারা মন্দকে ঘৃণা ক'রে সবর করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, যাতে সাপ মারতে গিয়ে ছিপ ভেঙ্গে না যায়।

দ্বিতীয় পর্যায় ঃ মুখ বা জিহ্বা দ্বারা বাধা

যদি শক্তি প্রয়োগ ক'রে সরাসরি মন্দ দূর করতে না পারা যায় অথবা কোন অশুভ ঘটনার ভয় হয়, কোন বড় মন্দ সৃষ্টির আশঙ্কা হয় অথবা মন্দ প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা হয়, তাহলে জিহ্বা প্রয়োগ করা উচিত।

যেমন যদি কর্তার প্রশংসা ক'রে তার মন্দ দূর করা যায়, তাহলে তা-ই বাঞ্ছনীয়।

উপদেশ কাজে দেবে মনে হলে, তা-ই করা কর্তব্য।

গঞ্জনা-ভর্ৎসনায় লাভ হবে বলে মনে হলে, তা-ই ব্যবহার্য।

ডাঁট-ধমক উপকারী হবে বলে মনে হলে, তা-ই প্রযোজ্য।

নচেৎ বিপরীত কিছুর আশঙ্কা থাকলে চুপ থাকাই উত্তম।

মুসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)এর দাওয়াতের ইতিহাস দেখুন।

বন্ধ ক'রে রেখেছে। অতঃপর উপদেশ দিতে শুরু করলেন। কাজের কারণ না জেনে এই শ্রেণীর উপদেশ দিতে গেলে অনেক সময় বোকার পরিচয় দেওয়া হয়।

যেমন, অস্পষ্ট মন্দের জন্য জাসূসী বা গোয়েন্দাগিরি করা যাবে না। যেহেতু মহান আল্লাহ আমাদেরকে জাসূসী করতে নিষেধ করেছেন। *(হুজুরাতঃ ১২)*

অবশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মহা বিপত্তি কালের কথা স্বতন্ত্র।

কোথাও লুকিয়ে টেপ বা ক্যামেরা রেখে অথবা গোপনে কারো ঘরে ঢুকে মন্দের খবর নেওয়া জরুরী নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

"যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ দেখবে....." যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ শুনবে....." অথবা "যে ব্যক্তি কোন মন্দ কাজ জানবে....." নয়। অবশ্য এ ক্ষেত্রে আমভাবে নসীহত তো করাই যাবে।

কথিত আছে যে, একদা উমার ؓ এক ব্যক্তির দেওয়াল টপকে বাড়ির ভিতরে তাকে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত পেলেন। লোকটি দেখে তাঁকে বলল, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি যদিও আল্লাহর নাফরমানি করেছি; কিন্তু আপনিও দেখছি তিনভাবে আল্লাহর নাফরমানি করলেন!'

উমার ؓ বললেন, 'তা কীভাবে?'

লোকটি বলল, 'মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা জাসূসী করো না" *(হুজুরাত ঃ ১২)* অথচ আপনি তা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "দরজা দিয়ে বাড়ি প্রবেশ কর" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৯)* অথচ আপনি দেওয়াল টপকে বাড়ি প্রবেশ করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না।" *(নূরঃ২৭)* অথচ আপনি তাই করেছেন!'

উমার ؓ তা শুনে ভুল বুঝতে পেরে তওবার শর্তারোপ ক'রে তাকে ক্ষমা ক'রে দিলেন। *(তফসীর রূহুল মাআনী ২৬/১৫৭)*

তৃতীয়তঃ যদি শক্তি দ্বারা তা বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তাহলেও ভেবে দেখতে হবে যে, মন্দে বাধা দেওয়ার পরিণাম কী হতে পারে?

ঐ মন্দ কাজে বাধা দিলে তার চাইতে বড় মন্দ অথবা কোন ফিতনা সৃষ্টি হবে না তো?

ঐ মন্দ কাজে বাধা দিলে তার সাথে অন্য আরেকটি মন্দ সৃষ্টি হবে না তো?

তা হলে সে কাজে বাধা দেওয়া যাবে না।

ঐ মন্দ কাজে বাধা দিলে তার অনুরূপ মন্দ সৃষ্টি হবে না তো?

তা হলে তাতে বাধা দিয়ে কোন লাভ নেই। অবশ্য দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত

মূসা ﷺ হারূন ﷺ-কে জাতির কাছে রেখে তুর পাহাড়ে গেলেন। এসে দেখলেন, জাতির কলঙ্করা বাছুর-মূর্তির পূজা শুরু ক'রে দিয়েছে! তা দেখে হারূন ﷺ কিন্তু চুপ ছিলেন না। শির্ক দেখে চুপ থাকা হিকমত নয়। কিছু না পারলে উপদেশ তো দিতেই হবে। তিনি বাধা দেওয়া সত্ত্বেও জাতি মানল না। মহান আল্লাহ তাঁদের ইতিহাস উল্লেখ ক'রে বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত অবস্থায় স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল, তখন বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কীই না জঘন্য কাজ করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বেই কেন তোমরা তাড়াহুড়া করতে গেলে?' সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং তার ভাইকে মাথায় ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারূন বলল, 'হে আমার মায়ের পুত্র (সহোদর)! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সুতরাং তুমি আমাকে নিয়ে শত্রু হাসায়ো না এবং আমাকে অনাচারীদের দলভুক্ত গণ্য করো না। *(আ'রাফ ১৫০)*

}

( )

( ) ( )

( )

( ) {

অর্থাৎ, হারূন ওদেরকে পূর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তোমাদের কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক পরম দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।' ওরা বলেছিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না।' মূসা বলল, 'হে হারূন! তুমি যখন দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?' হারূন বলল, 'হে আমার সহোদর! আপনি আমার দাড়ি ও মাথা (চুল) ধরবেন

না। আসলে আমি আশঙ্কা করলাম যে, আপনি বলবেন, তুমি বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা করনি।' *(ত্বাহাঃ ৯০-৯৪)*

তৃতীয় পর্যায় ঃ অন্তর দ্বারা ঘৃণা

হাত ও জিভ ব্যবহার করার যদি ক্ষমতা না থাকে, তাহলে সেই মন্দকে অন্তর থেকে ঘৃণা করতে হবে। প্রয়োজন নেই মৌচাকে ঢিল মেরে হুলের বিঁধুনি খাওয়া। প্রয়োজন নেই জলের ছিটা দিয়ে লগির গুঁতো খাওয়া। যেখানে উপকারের বদলে অপকার হবে, মন্দও দূর হবে না, উল্টা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে, সেখানে আবেগে ঝাঁপ দিয়ে পড়া সঙ্গত নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোন মুমিনের উচিত নয়।" সাহাবাগণ বললেন, 'সে নিজেকে লাঞ্ছিত কীভাবে করে হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেই বিপদকে সে বহন করতে চায়, যা বহন করার ক্ষমতা সে রাখে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ৬১৩নং)*

উপদেশ দিলে কাজে লাগতে পারে। মহান আল্লাহ উপদেশ দিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৫)*

কিন্তু তিনি এ কথাও বলেছেন,

( ) { ( ) }

অর্থাৎ, অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক; তুমি তো একজন উপদেশ দাতা মাত্র। তুমি তাদের কর্ম নিয়ন্ত্রক নও। *(গাশিয়াহ ঃ ২১-২২)*

( ) { }

অর্থাৎ, অতএব উপদেশ দাও; যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। (আ'লা ঃ ৯)

তবে সম্ভব হলে অবশ্যই মজলিস ত্যাগ করতে হবে। নচেৎ মন্দকে অন্তরে ঘৃণা জেনে তার মজলিসে অবস্থান করলে, সে ঘৃণার দাম কী?

মহান আল্লাহ বলেন,

}

{

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন

হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(আনআমঃ ৬৮)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত না হয় তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও অবিশ্বাসী সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। *(নিসাঃ ১৪০)*

সত্যিই তো, 'যাকে করি ছি, তাকে ভাতের পাশে ঘি' করলে, সে ছি করার দাম কী?

অন্তর দ্বারা সে মন্দকে ঘৃণা জানার সাথে তার প্রতিবেশ ও সাহচর্য বর্জন করার চেষ্টা করতে হবে। মনে এই অনুতাপ ও ক্ষোভ থাকবে যে, যদি সে তার কোন প্রতিবাদ ও প্রতিকার করতে পারত, তাহলে নিশ্চয় নিশ্চুপ থাকত না।

সর্বশেষ এই অবস্থাকে দুর্বলতম ঈমানের পরিচায়ক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মন্দকর্মে বাধা না দিতে পেরে কেবল অন্তর দ্বারা ঘৃণা করাটাও ঈমানের পরিচয়, তবে তা সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের। ঈমানের যে সকল সুফল আছে, তার মধ্যে এ ফলটি বড় দুর্বল।

এখান থেকে আরও একটি কথা বুঝা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি মন্দকর্মে বাধা না দেয় এবং মন্দকে অন্তরে ঘৃণাও না করে, তাহলে তার সে অন্তরে ঈমান মৃতপ্রায়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মানুষের হৃদয়ে চাটাইয়ের পাতা (বা ছিলকার) মত একটির পর একটি করে ক্রমান্বয়ে ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। সুতরাং যে হৃদয়ে সে ফিতনা সঞ্চারিত হবে, সে হৃদয়ে একটি কালো দাগ পড়ে যাবে এবং যে হৃদয় তার নিন্দা ও প্রতিবাদ করবে সে হৃদয়ে একটি সাদা দাগ অঙ্কিত হবে। পরিশেষে (সকল মানুষের) হৃদয়গুলি দুই শ্রেণীর হৃদয়ে পরিণত হবে। প্রথম শ্রেণীর হৃদয় হবে মসৃণ পাথরের ন্যায় সাদা; এমন হৃদয় আকাশ-পৃথিবী অবশিষ্ট থাকা অবধি-কাল পর্যন্ত কোন ফিতনা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর হৃদয় হবে উবুড় করা কলসীর

মত ছাই রঙের; এমন হৃদয় তার সঞ্চারিত ধারণা ছাড়া কোন ভালোকে ভালো বলে জানবে না এবং মন্দকে মন্দ মনে করবে না (তার প্রতিবাদও করবে না)।" *(মুসলিম ১৪৪ নং)*

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান এবং জিহাদ

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান এক প্রকার জিহাদ। জিহাদ হয় জিভ, কলম ও শক্তি দ্বারা। অনুরূপ সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানও। তবে সাধারণতঃ জিহাদ বলতে কাফেরদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধকে বুঝানো হয়। পক্ষান্তরে সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান মুসলিম-অমুসলিম সকলের ক্ষেত্রে হলেও সাধারণতঃ তা মুসলিম সমাজে প্রযোজ্য হয়। তাছাড়া জিহাদে ইমাম জরুরী, কিন্তু সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানের ক্ষেত্রে তা নয়।

মহানবী ﷺ-এর মন্দ কাজে বাধা দানের কিছু নমুনা

মহানবী ﷺ-এর পুরো জীবনটাই ছিল সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করার ময়দান। তবে কিছু এমন হাদীস পেশ করা উত্তম হবে, যাতে বুঝা যায় যে, তিনি কীভাবে মন্দ কাজে বাধা দিতেন?

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ একটি লোকের হাতে সোনার আংটি দেখতে পেলেন। অতঃপর তিনি তা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বললেন, "তোমাদের মধ্যে একজন স্বেচ্ছায় আগুনের টুক্‌রা নিয়ে তা স্বহস্তে রাখতে চায়!" অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে গেলে সেই লোকটিকে বলা হল, 'তুমি তোমার আংটি নিয়ে নাও এবং (তা বিক্রি করে অথবা উপঢৌকন দিয়ে) তার দ্বারা উপকৃত হও।' সে বলল, 'না। আল্লাহর কসম! রাসূলুল্লাহ ﷺ যা ফেলে দিয়েছেন তা আমি কখনই তুলে নেব না।' *(মুসলিম)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ (তাবূক যুদ্ধের) সফর থেকে ফিরে এলেন। আমি আমার কক্ষের তাক বা জানলায় পাতলা কাপড়ের পর্দা টাঙ্গিয়ে ছিলাম; তাতে ছিল (প্রাণীর) অনেকগুলি চিত্র। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ওটা দেখলেন, তখন তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। তিনি বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন সেসব মানুষের সবচেয়ে বেশি শাস্তি হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ তৈরী করবে। আয়েশা

(রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, সুতরাং আমরা তা ছিঁড়ে ফেললাম এবং তা দিয়ে একটি বা দু’টি হেলান-বালিশ তৈরী করলাম।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক’রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)। সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।’ দ্বিতীয়জন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।’ তৃতীয়জন বললেন, ‘আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন, “তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।” *(বুখারী-মুসলিম)*

আবূ হুরাইরা ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ (বাজারে) এক রাশীকৃত খাদ্য (শস্যের) কাছে গিয়ে তার ভিতরে হাত প্রবেশ করালেন। তিনি আঙ্গুল দ্বারা অনুভব করলেন যে, ভিতরের শস্য ভিজে আছে। বললেন, “ওহে ব্যাপারী! এ কী ব্যাপার?” ব্যাপারী বলল, ‘হে আল্লাহর রসূল! বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।’ তিনি বললেন, “ভিজেগুলোকে শস্যের উপরে রাখলে না কেন, যাতে লোকে দেখতে পেত? যে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।” *(মুসলিম ১০২, ইবনে মাজাহ ২২২৪, তিরমিযী ১৩১৫, আবূ দাউদ ৩৪৫২নং)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, হাসান বিন আলী ﷺ সাদকার একটি খুরমা নিয়ে তাঁর মুখে রাখলেন। তা দেখে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “ছিঃ ছিঃ! ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমরা সাদকাহ খাই না?” *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “আমাদের জন্য সাদকাহ হালাল নয়।”

দাওয়াতের উপকারিতা

দাওয়াতের ময়দানে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা পার্থিব জীবনেও নানাভাবে উপকৃত হন। যেমন ঃ-

১। দাঈ মনে এক প্রকার শান্তি পান। যেহেতু তিনি মহান আল্লাহর ফরয পালনে সবার ঊর্ধ্বে থাকেন। ইল্‌ম, আমল, তাবলীগ ও সবরের অধিকারী হন। সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পেশায় তাঁর মন ও মস্তিষ্ক মশগূল থাকে।

দুনিয়াদার কোন মানুষ যেমন কোন ব্যস্ততা বা চাকরি না পেলে তার মন বিক্ষিপ্ত থাকে, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে, কিন্তু একটা ভাল চাকরি পেলে তার মন চাঙ্গা থাকে, হৃদয়ে শান্তি থাকে। ঠিক তেমনি একজন দ্বীনের দাঈর মন উদ্বেগহীন থাকে।

২। দ্বীনের দাঈর ইল্‌ম দিনের দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। যেহেতু দাওয়াতের কাজে তাঁকে প্রস্তুতি নিতে হয়। বহু বই-পুস্তক ঘাঁটতে হয়, প্রশ্নের সম্মুখীন হলে উত্তরের খোঁজে বহু অনুসন্ধান চালাতে হয়।

৩। দ্বীনের দাঈর ঈমান বৃদ্ধিলাভ করতে থাকে। যেহেতু ইল্‌ম ও আমলের বৃদ্ধি অনুসারে ঈমানও বৃদ্ধিলাভ করে।

৪। দ্বীনের দাঈ আমল ও আখলাকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হন। যেহেতু তিনি হন আদর্শ ও ইমাম। সকল মানুষের সজাগ দৃষ্টি তাঁর উপর থাকে। তাঁর ছোট-বড় সবকিছু সাধারণ মানুষের অনুসরণীয় হয়। সমালোচক ও হিংসুক ছিদ্রান্বেষণের সুযোগ পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। ফলে তাঁকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হতে হয়।

৫। দ্বীনের দাঈ অতিরিক্ত গুণের অধিকারী হন। তিনি সামাজিক হন, যেহেতু সমাজকে নিয়ে তাঁকে চলতে হয়। তাঁর ভ্রাতৃত্ববোধ থাকে, যেহেতু ভ্রাতৃমণ্ডলীর সাথে তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় হয়। তিনি মানব-দরদী হন, যেহেতু মানবের কল্যাণ সাধন তাঁর পেশা ও নেশা হয়। *(আদ-দা’ওয়াতু ইলাল্লাহ, ড. আব্দুল্লাহ আল-খাত্বের ১৪/-১৭পৃঃ থেকে গৃহীত)*

ইল্‌মের হাতিয়ার

শিকারী অথচ সঙ্গে কোন হাতিয়ার নেই, মুজাহিদ অথচ সঙ্গে অস্ত্র নেই, সার্জেন বা ম্যাকানিক অথচ সঙ্গে যন্ত্রপাতি নেই, এরা কি সফল হবে? কক্ষনো না।

যে দাঈ, দাওয়াতের কাজ করবে, তার শরয়ী ইল্‌ম থাকতে হবে। অর্থাৎ, অন্ততঃপক্ষে যে ভাল কাজটির আদেশ সে দেবে এবং যে খারাপ কাজটি

থেকে নিষেধ করবে, সে ব্যাপারে তার যথেষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যে লোকটিকে সে দাওয়াত দেবে, তার সম্বন্ধেও সম্যক ধারণা থাকতে হবে। কেননা, একজন অন্ধ তো অন্য অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না। আর অন্ধত্বের কারণ অজানা থাকলে, তা দূর করা যায় না।

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ﷺ-কে বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি বল, 'এটাই আমার পথ। আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করি সজ্ঞানে আমি এবং আমার অনুসারীগণও। আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।' *(ইউসুফঃ ১০৮)*

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে জানিয়ে দাও যে, এ হল আমার পথ ও পদ্ধতি। আমার পথ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র দিকে দাওয়াতের পথ। আমি এবং আমার অনুসারীরা সেই পথের দিকে মানুষকে আহবান করি। জ্ঞান, দলীল ও প্রত্যয় দ্বারা সমৃদ্ধ সে দাওয়াত। সে দাওয়াতের শরয়ী দলীল আছে, সুস্থ মস্তিষ্কের যৌক্তিকতা আছে। তাতে নেই কোন সন্দেহ, নেই কোন প্রচ্ছন্নতা।

সুতরাং 'বুযুর্গরা বলেছেন, আল্লাহ বা আল্লাহর রসূল নাকি বলেছেন' এমন অস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে দাওয়াতের কাজ হয় না। সন্দেহ থাকলে আগে তা দূরীভূত ক'রে সে বিষয়ে মুখ খুলতে হবে। বিনা ইলমে আল্লাহর ইবাদত করা যায় না, দাওয়াতের কাজ তো দূরের কথা।

উমার বিন আব্দুল আযীয (রঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি বিনা ইলমে আল্লাহর ইবাদত করে, সে ব্যক্তি সংস্কার করার চাইতে বেশী বিগড়ে ফেলবে।'

যেমন অজ্ঞ সার্জেন অপারেশনে কী কাটতে কী কেটে ফেলবে, ঠিক তেমনি অজ্ঞ দাঈ কী শুনতে কী ফতোয়া দিয়ে মানুষকে ভ্রষ্ট ক'রে ফেলবে। অবশ্যই 'নিম হাকীম খতরায়ে জান, নিম মোল্লা খাতরায়ে ঈমান।'

জ্ঞান-বিদ্যা না রেখে দাওয়াতের কাজ করা বড় বিপজ্জনক কাজ। এ যেন অন্ধকারে লাইটবিহীন গাড়ি চালানোর কাজের মতো। যার পরিণাম ধ্বংস ও ক্ষতি ছাড়া আর কী?

জাবের ﷺ বলেন, একদা আমরা কোন সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তির মাথায় পাথরের আঘাত লেগে ক্ষত হয়েছিল। এরপর তার স্বপ্নদোষও হল। সে সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার জন্য কি তায়াম্মুম বৈধ মনে কর?' সকলে বলল, 'তুমি পানি ব্যবহার করতে অক্ষম নও। অতএব তোমার জন্য আমরা তায়াম্মুম বৈধ মনে করি না।'

তা শুনে লোকটি গোসল করল এবং এর প্রতিক্রিয়ায় সে মারা গেল। অতঃপর আমরা যখন নবী ﷺ-এর নিকট ফিরে এলাম, তখন তাঁকে সেই লোকটার ঘটনা খুলে বললাম। তা শুনে তিনি বললেন, "ওরা ওকে মেরে ফেলল, আল্লাহ ওদেরকে ধ্বংস করুক! যদি ওরা জানত না, তবে জেনে কেন নেয়নি? অজ্ঞতার ওষুধ তো প্রশ্নই।" *(সহীহ আবূ দাউদ ৩২৫, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ৫৩১নং)*

না জেনে ফতোয়া দিয়ে এক আলেম নিজেই হত্যার শিকার হয়েছিল। বনী ইস্রাইলের যুগে একটি লোক ছিল; যে ৯৯টি মানুষ খুন করেছিল! অতঃপর বিবেকের কাছে অপরাধী হয়ে সে একদিন লোকেদেরকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় আলেম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তাকে এক আলেমের কথা বলা হল। সে তার কাছে এসে বলল, 'সে ৯৯ জন মানুষকে হত্যা করেছে। এখন কি তার তওবার কোন সুযোগ আছে?' সে বলল, 'না।' (এতগুলি খুন ক'রে আবার ক্ষমা পাওয়া যায়?!) সুতরাং সে (ক্রোধান্বিত হয়ে) তাকেও হত্যা ক'রে একশত পূরণ ক'রে দিল! *(বুখারী-মুসলিম)*

বিনা ইলমে দাওয়াতী কাজ বড় বিপজ্জনক। তাতে মানুষকে হিদায়াতের বদলে ভ্রষ্ট করা হয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ বান্দাদের নিকট থেকে ইল্ম ছিনিয়ে নেওয়ার মত তুলে নেবেন না। বরং উলামা তুলে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না, তখন মানুষ মূর্খদেরকে গুরু (ও নেতা) রূপে বরণ করবে। ফলে তারা জিজ্ঞাসিত হলে বিনা ইলমে ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজে ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকে ভ্রষ্ট করবে। *(বুখারী ও মুসলিম ২৬৭৩ নং)*

আর সে ভ্রষ্টতার মাশুল অবশ্যই দিতে হবে কিয়ামতে। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং তাদেরও পাপভার যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট। *(নাহলঃ ২৫)*

অনেক আলেম আছেন, যাঁদের কাছে ইলমের ভাণ্ডার আছে, কিন্তু তাঁরা তা বিতরণ করতে জানেন না, তাঁরা সেই মানুষদের মনে পৌঁছতে পারেন না, যাদের মনে ইলমের পিপাসা আছে। অথবা সেই পদ্ধতি জানেন না, যে পদ্ধতিতে মানুষের মনের জমিতে ইলমের সেঁচ দিতে হয়।

পক্ষান্তরে অনেক দাঈ আছেন, যাঁরা ইল্ম বিতরণ করতে জানেন, কিন্তু

ইখলাস

দাওয়াতের কাজে আন্তরিকতা থাকতে হবে দাঈর। পার্থিব কোন স্বার্থ থাকলে হবে না। কোন অর্থ, সুনাম বা খ্যাতি অর্জনের লোভ থাকলে চলবে না। কারণ, তাতে তার পরকাল বরবাদ তো হবেই, পরন্তু দাওয়াতও ফলপ্রসূ হবে না। যেহেতু যে কথা অন্তর থেকে বের হয়, সে কথাই অপরের অন্তরে গিয়ে স্থান নেয়। আর যে কথার মাঝে আন্তরিকতা থাকে না, সে কথাকে কোন অন্তর স্থান দেয় না।

অবশ্যই মানুষ নিঃস্বার্থ প্রেম পছন্দ করে, পছন্দ করে নিঃস্বার্থ উপদেশ ও উপকার। সুতরাং কোন স্বার্থপরতার কথা মানুষের কাছে প্রকাশ হলে সে প্রেম, সে উপদেশ ও উপকার ব্যর্থ যায়।

চাকরি করলেও আসল উদ্দেশ্য যেন অর্থোপার্জন না হয়।

আসলে তাওহীদের ভিত্তিতে প্রত্যেক আমল কবুল হওয়ার শর্ত হল দু'টি ঃ ইখলাস (কেবল আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধতা, আন্তরিকতা) ও তরীকায়ে মুহাম্মাদী।

শয়তান অবশ্যই চেষ্টা করে যে, মু'মিনের আমলে ভেজাল অনুপ্রবেশ করুক। সে তো মূলেই চায় না যে, কোন মু'মিন কোন নেক আমল করুক। বাধা লংঘন ক'রে যখন করতে সফল হয়, তখন সে চায়, তা কীভাবে নষ্ট করা যায়। তখন উক্ত শর্ত-দু'টির মধ্যে কোন একটির ত্রুটি ঘটিয়ে, আমলে 'রিয়া' বা বিদআত ঢুকিয়ে আমলকে সমূলে বিনষ্ট করতে চেষ্টা করে।

দাঈর মনেও নানাবিধ প্রলোভন সৃষ্টি ক'রে দাওয়াতী কাজকে পণ্ড করতে চায়। যেমন এই যে ঃ-

১। দাঈর মনে নেতৃত্ব ও গদির লোভ ঢুকিয়ে দেয়। যেমন যাঁরা কোন সংগঠন ও দলগত দাওয়াতী কাজ করেন, তাঁদের অনেকের অবস্থা এই যে, তাঁদের কাউকে নেতা বা প্রধান না বানানো হলে দল-বদল করেন অথবা দাওয়াতের কাজই বর্জন করেন!

২। নানা কায়দা-কৌশলে নিজের মর্যাদা, খ্যাতি, যশ ও সুনাম পছন্দ করতে লাগিয়ে দেয়। তার মনে অহমিকা ঢুকিয়ে অপর সকলকে তুচ্ছজ্ঞান করতে অভ্যাসী বানিয়ে দেয়।

৩। দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে অর্থোপার্জনের পথ খুলে তার মনে অর্থলোলুপতা প্রবিষ্ট করে। ফলে অর্থই হয় তার আসল উদ্দেশ্য।

৪। তার মন থেকে সওয়াবের নিয়তটাকেই বিলীন ক'রে দেয়। আর তখন সে দাওয়াতের কাজ করলেও যা কিছু করে, আসলে তা পরের

তাঁদের নিকট ইল্মই নেই। মানুষের মনের গভীরে পৌঁছতে পারেন, কিন্তু তাদের পিপাসা মিটাবার মত পানীয় তাঁদের কাছে থাকে না। তাঁরা সিঞ্চন-পদ্ধতি জানেন, কিন্তু তাঁর পুকুরে পানিই নেই।তাই দাঈর উচিত, যথেষ্ট পরিমাণের পানি সঞ্চয় রাখা। কোন মতেই স্বল্প পানি সঞ্চয় ক'রে ক্ষান্ত না হওয়া।

হ্যাঁ, 'বাল্লিগু আন্নী অলাও আয়াহ' ঠিকই আছে। কিন্তু কেবল 'আয়াহ' নিয়েই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। যেমন যার অল্প ইল্ম আছে, তারও উচিত নয়, দাওয়াতের কাজে পিছপা থাকা। সে দাওয়াতের কাজ যথাসাধ্য করবে, তবে ফতোয়া দেবে না। যেহেতু দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে ফতোয়া দেওয়া জরুরী নয়। তবে জিজ্ঞাসিত হলে মুফতী আলেমদের হাওয়ালা দেবে। এ ক্ষেত্রে নিজের 'মান' রাখতে গিয়ে মুখ খুলবে না।

দাঈকে আলেম হতে হবে। কিতাব ও সুন্নাহর ইল্ম থাকতে হবে। সহীহ-যয়ীফের তমীয থাকতে হবে। বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইসলামের বিজয় আসবে। কেউ হবে বক্তা, কেউ হবে লেখক, কেউ হবে মুদার্রিস, কেউ হবে খতীব। তালেবে-ইল্ম হয়েও দাওয়াতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার গুঞ্জরণে শোনা যাবে ইসলামী দাওয়াতের সুমধুর জয়গান।

মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেন, 'তোমরা ইল্ম শিক্ষা কর। কারণ আল্লাহর ওয়াস্তে তা শিক্ষা করা আল্লাহভীতি, তার অনুসন্ধান হল ইবাদত, তার অধ্যয়ন হল তসবীহ, তার খোঁজে বের হওয়া হল জিহাদ, তা যে জানে না তাকে শিক্ষা দেওয়া হল সদকাহ, আহলে ইল্মের কাছে তা ব্যয় করা হল আল্লাহর নৈকট্য। ইল্ম হল নির্জনে সঙ্গী স্বরূপ, একাকীত্বে সাথী স্বরূপ, দ্বীনদারীর দলীল স্বরূপ, দুঃখে-শোকে ধৈর্য স্বরূপ, বন্ধু মহলে উযীর স্বরূপ, অচিন্ দেশে আত্মীয় স্বরূপ এবং জান্নাতের পথের দিশারী।'

আলী বিন আবী তালেব বলেন, 'জ্ঞান হল আবরক পর্দা, সেই পর্দা দিয়ে তোমার দৈহিক ত্রুটি গোপন কর। আর ইল্ম হল ক্ষুরধার তরবারি, তা দিয়ে তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই কর।'

আরবী কবি বলেন,

অর্থাৎ, ইল্ম অনুসন্ধান কর, তাতে আলসেমি করো না। কারণ অলস লোকদের জন্য মঙ্গল বহু দূরে থাকে।

ইল্মের বৃদ্ধিতে রয়েছে শত্রুর পরাজয়। আর ইল্মের সৌন্দর্য হল আমল সংশোধন করা।

দেখাদেখি করে।

আর এ কথা বিদিত যে, নিয়ত মানে মনের সংকল্প। আর তারই কারণে একই কাজের মান প্রায় ৬ রকম হয়। যেমন, ৬টি লোককে মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা যাওয়া করতে দেখলেন। সকলের কাজ কিন্তু বাহ্যতঃ একই ঃ মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা যাওয়া করা। অথচ সকলের কাজের মান এক নয়। যেহেতু ঐ একই কাজের হেতু ও উদ্দেশ্য এক নয়।

সুতরাং ১ম লোকটিকে কারণ জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল, 'বহুদিন হল আমাদের বিয়ে-শাদী হয়েছে, কিন্তু ছেলে-মেয়ে হয়নি। এক সাহেব বললেন, যদি আমি এইভাবে মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা যাওয়া করি, তাহলে আমাদের সন্তান হবে।'

নিশ্চয় আপনি এ লোকটির কাজকে 'শির্ক' বলবেন।

২য় জনকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল, 'আমাকে এক বুযুর্গ বললেন, আমি যদি এইভাবে মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা যাওয়া করি, তাহলে এক উমরার সওয়াব হবে।'

নিশ্চয় আপনি এ লোকটির কাজকে 'বিদআত' বলবেন।

৩য় জনকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল, 'এইভাবে মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা যাওয়া করা আমার ডিউটি। কারণ আমি টহলরত পাহারাদার।'

নিশ্চয় আপনি এ লোকটির কাজকে 'ওয়াজেব' বলবেন।

৪র্থ জনকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল, 'এইভাবে মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা যাওয়া করি, তাহলে স্বাস্থ্যটা ভাল থাকবে।'

নিশ্চয় আপনি এ লোকটির কাজকে 'মুস্তাহাব' বলবেন।

৫ম জনকে জিজ্ঞাসা করলে, সে বলল, 'এইভাবে মাদ্রাসা থেকে মসজিদ পর্যন্ত আসা যাওয়া করে আমি আমার হারিয়ে যাওয়া একটি জিনিস খুঁজছি।'

নিশ্চয় আপনি এ লোকটির কাজকে 'মুবাহ' বলবেন।

৬ষ্ঠ জনকে জিজ্ঞাসা করলে, সে অবৈধ মহিলা দেখে বেড়ানোর কথা জানাল।

নিশ্চয় আপনি এ লোকটির কাজকে 'হারাম' বলবেন।

সুতরাং একই কাজকে মনের পরশে ছয় বা তার থেকে বেশি রকম হতে পারে। দাঈর কাজও অনুরূপ। মন শুদ্ধ হলে, তাঁর আমল শুদ্ধ। নচেৎ মন ঠিক না থাকলে, সব বেঠিক।

আব্দুল্লাহ বিন মুত্বার্রিফ বলেন, 'অন্তরের সংশুদ্ধি আছে আমলের সংশুদ্ধিতে। আর আমলের সংশুদ্ধি আছে নিয়তের সংশুদ্ধিতে।'

ইবনুল মুবারক বলেন, 'কোন কোন ক্ষুদ্র কর্মকে নিয়ত মহান ক'রে তোলে। আর কোন কোন মহান কর্মকে নিয়তই ক্ষুদ্র ক'রে ফেলে।'

বাঞ্ছিত হল, প্রত্যেক আমল একমাত্র আল্লাহর জন্য বিশুদ্ধ হওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। *(বাইয়িনাহঃ ৫)*

{ }

অর্থাৎ, যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।' *(কাহ্ফঃ ১১০)*

মন যদি দুনিয়া চায়, তাহলে দুনিয়া পাওয়া যাবে। কিন্তু আখেরাতে কোন অংশ পাওয়া যাবে না। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( )

( ) {

অর্থাৎ, যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান ক'রে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু ক'রে থাকে, তাও নিরর্থক হবে। *(হূদঃ ১৫-১৬)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ) আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে, তারই জন্য হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মনের পরশ এতই পবিত্র যে, ভাল কাজের নিয়ত করলে এবং সে কাজ করতে না পারলেও একটি সওয়াব লেখা হয়। আর করতে পারলে অনেক অনেক সওয়াব লেখা হয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মহান প্রভু

থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, "নিশ্চয় আল্লাহ পুণ্যসমূহ ও পাপসমূহ লিখে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার ব্যাখ্যাও করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত করতে পারে না, আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা তার জন্য (কেবল নিয়ত করার বিনিময়ে) একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ, বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে, তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি পূর্ণ নেকী হিসাবে লিখে দেন। আর সে যদি সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আল্লাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর খাস দয়া যে, নিয়তের উপরেও তিনি বান্দাকে সওয়াব দেন।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনসারী ؓ বলেন, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে এক অভিযানে ছিলাম। তিনি বললেন, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যত সফর করছ এবং যে কোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে।" আর একটি বর্ণনায় আছে যে, "তারা সওয়াবে তোমাদের অংশীদার।" *(মুসলিম)*

আনাস ؓ বলেন, নবী ﷺ-এর সাথে তাবূক অভিযান থেকে আমাদের প্রত্যাবর্তনকালে তিনি বললেন যে, আমাদের পিছনে মদীনায় এরূপ কিছু লোক আছে যারা প্রত্যেক গিরিপথ বা উপত্যকা অতিক্রমকালে আমাদের সাথে রয়েছে। বিশেষ ওজর তাদেরকে ঘরে থাকতে বাধ্য করেছে। *(বুখারী)*

নিয়তের উপর কর্ম নির্ভরশীল। নিয়তই কর্মের মান বদলে দেয়।

মা'ন ইবনে ইয়াযীদ ؓ বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ দান করার জন্য কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা বের করলেন। অতঃপর তিনি সেগুলি (দান করতে) মসজিদে একটি লোককে দায়িত্ব দিলেন। আমি (মসজিদে) এসে তার কাছ থেকে (অন্যান্য ভিক্ষুকের মত) তা নিয়ে নিলাম এবং তা নিয়ে বাড়ী এলাম। (যখন আমার পিতা এ ব্যাপারে অবগত হলেন, তখন) বললেন, 'আল্লাহর কসম! তোমাকে দেওয়ার নিয়ত আমার ছিল না। (ফলে এগুলি আমার জন্য হালাল হবে কি না, তা জানার উদ্দেশ্যে) আমি আমার পিতাকে নিয়ে রসূলের খিদমতে উপস্থিত হলাম। তিনি বললেন, "হে ইয়াযীদ! তোমার জন্য সেই বিনিময় রয়েছে, যার নিয়ত তুমি করেছ এবং

হে মা'ন! তুমি যা নিয়েছ তা তোমার জন্য হালাল।" *(বুখারী)*

সা'দ বিন আবী অক্কাস ؓ বলেন, বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রুগ্ণ অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান ক'রে দেব?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি?' তিনি বললেন, "এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে, তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও, তারও তুমি বিনিময় পাবে।" *(বুখারী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" *(মুসলিম)*

আবূ মূসা আশআরী ؓ বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ-কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, যে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য যুদ্ধ করে, অন্ধ পক্ষপাতিত্বের জন্য যুদ্ধ করে এবং লোক-প্রদর্শনের জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) যুদ্ধ করে, তার কোন্ যুদ্ধটি আল্লাহর পথে হয়? আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর কালেমাকে উঁচু করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করে, একমাত্র তারই যুদ্ধ আল্লাহর পথে হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবূ বাকরাহ ؓ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোসে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে।" আমি বললাম, 'হে আল্লাহ রসূল! হত্যাকারীর দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট; কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কী? (সে কী কারণে দোযখে যাবে?)' তিনি বললেন, "সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আল্লাহর কাজ লোকের জন্য করলে শির্ক হয়। দাঈর দাওয়াতও শির্কে

পরিণত হতে পারে।

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মহান আল্লাহ বলেন, "আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি। (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট ক'রে দিই।)" *(মুসলিম)*

শুধু বর্জনই না, তার দস্তুরমতো হিসাব হয় এবং সবার আগে হয়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে, সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুজীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন,

'তুমি ঐ সকল নিয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও, সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" *(মুসলিম ১৯০৫ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দেবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দেবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

'যে ব্যক্তি শোনাবে' অর্থাৎ, যে তার আমলকে মানুষের সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ ও প্রচার করবে। 'আল্লাহ তা শুনিয়ে দেবেন' অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে (সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে) তাকে লাঞ্ছিত করবেন। 'যে ব্যক্তি দেখাবে' অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে স্বকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে, যাতে সে তাদের নিকট সম্মানার্হ হয়। 'আল্লাহ তা দেখিয়ে দেবেন' অর্থাৎ, সৃষ্টির সম্মুখে তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত (করে অপমানিত) করবেন। *(রিয়াযুস স্বালিহীন)*

কিন্তু নিয়ত ঠিক রেখে যদি সুনাম ছড়িয়ে যায়, তাহলে তাতে তো নামী লোকের কোন হাত থাকে না। তাই তাতে তাঁর কোন দোষও হবে না।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'বলুন, যে মানুষ সৎকাজ করে, আর লোকে তার প্রশংসা ক'রে থাকে, (তাহলে এরূপ কাজ কি রিয়া বলে গণ্য হবে?)' তিনি বললেন, "এটা মু'মিনের সত্বর সুসংবাদ।" *(মুসলিম)*

পক্ষান্তরে দাঈর দাওয়াত-কার্যের পশ্চাতে উদ্দেশ্য যদি অর্থোপার্জন থাকে, তাহলে তার অবস্থাও ভীষণ সাংঘাতিক।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে বিদ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না। *(আবূ দাউদ)*

দাওয়াতের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করলে নিয়তে ভেজাল অনুপ্রবেশ করে। আর এ জন্যই প্রত্যেক দ্বীনের দাঈ নবীগণের ঘোষণা ছিল, 'আমরা কোন প্রতিদান চাই না। আমরা আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাব।'

মহান আল্লাহ তাঁদের কথা বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে আমি তো তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার পারিশ্রমিক তো শুধু আল্লাহরই যিম্মায় রয়েছে। আর আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভুক্ত থাকি।' *(ইউনুসঃ ৭২)*

( ) { }

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! আমি এতে তোমাদের কাছে কোন ধন-সম্পদ চাচ্ছি না; আমার বিনিময় তো শুধু আল্লাহর দায়িত্বে রয়েছে। আর আমি তো বিশ্বাসীদেরকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। নিশ্চয় তারা নিজেদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে। পরন্তু আমি দেখছি, তোমরা এক নির্বোধ সম্প্রদায়। *(হূদঃ ২৯)*

}

( ) {

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদের নিকট যে পারিশ্রমিক চেয়েছি, তা তোমাদের জন্যই; আমার পারিশ্রমিক আছে আল্লাহর নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে সাক্ষী।' *(সাবা'ঃ ৪৭)*

{ }

অর্থাৎ, আমি তোমাদের নিকট এর জন্য কোন প্রতিদান চাই না; আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রতিপালকের নিকটই আছে। *(সূরা শুআরা ১০৯, ১২৭, ১৪৫, ১৬৪, ১৮০)*

প্রত্যেক নবীই একই কথা বলেছেন এবং মানুষের মন থেকে সন্দেহ দূর ক'রে দিয়েছেন যে, দাওয়াতের পশ্চাতে তাঁর কোন পার্থিব স্বার্থ নেই, দাওয়াতের বিনিময়ে তিনি কোন পারিশ্রমিক চান না এবং এর অসীলায় তিনি মানুষের অর্থ কুক্ষিগত করতে চান না।

মানুষের ভালবাসা পেতে হলে, মানুষের নিকট সম্পদ চাওয়া যাবে না। মানুষের নিকট কিছু পাওয়ার আশা করলে হবে না। ভালবাসা পাওয়ার একটা নীতি হল, পাওয়ার আশা না ক'রে কেবল দিয়ে যাওয়া।

আবুল আব্বাস সাহ্‌ল ইবনে সা'দ ﵁ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।' তিনি বললেন, "দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকেদের ধন-সম্পদের

প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে।" *(ইবনে মাজাহ প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৪নং)*

মহান আল্লাহ তাঁর আয়াত ও প্রতিশ্রুতিকে সামান্য মূল্যে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

}

( )

( ) {

অর্থাৎ, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, যারা তা গোপন করে ও তার বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা কেবল আগুন দিয়ে আপন পেট পূর্ণ করে। শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদেরকে (পাপ-পঙ্কিলতা থেকে) পবিত্রও করবেন না; আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারাই সুপথের বদলে কুপথ এবং ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করেছে, (দোযখের) আগুনে তারা কতই না ধৈর্যশীল! *(বাক্বারাহঃ ৭৪-৭৫)*

উক্ত আয়াতে 'ইল্‌ম' গোপন করার নিন্দাও করা হয়েছে। আসলে আলেম হচ্ছে তিন প্রকার ঃ-

১। যিনি নিজের ইল্‌ম প্রচার করতে কার্পণ্য করেন এবং প্রয়োজনে প্রচার না ক'রে গোপন রেখে মানুষকে বঞ্চিত রাখেন।

২। যিনি নিজের ইল্‌ম গোপন করেন পার্থিব কোন স্বার্থ (যেমন অর্থ, গদি, পদ, নেতৃত্ব প্রভৃতি) লাভের অথবা হিফাযতের উদ্দেশ্যে।

৩। যিনি কার্পণ্য ক'রে ইল্‌ম গোপন করেন এবং পার্থিব কোন স্বার্থে তা প্রচার করেন না।

শেষোক্ত আলেম হলেন সর্বনিকৃষ্ট। আয়াতে এই শ্রেণীর আলেমদের কথাই বলা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, কিছু আলেম আছেন, যাঁরা শুধু আল্লাহর আয়াতকে গোপন ও বিক্রিই করেন না, বরং অন্যের আয়াতকেও আল্লাহর আয়াত বলে চালিয়ে দেন! তাঁরা মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এমনভাবে বলেন ও লিখেন, মনে হয় তা যেন আল্লাহরই আয়াত। এই শ্রেণীর আলেমদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, নিশ্চয় তাদের মধ্যে একদল লোক এমনও আছে, যারা এরূপভাবে জিহ্বা বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে, যাতে তোমরা মনে কর, তা আল্লাহর কিতাব; কিন্তু তা কিতাবের অংশ নয়। আর তারা বলে, 'তা আল্লাহর নিকট থেকে (সমাগত)'; কিন্তু তা আল্লাহর নিকট থেকে (সমাগত) নয় এবং তারা জেনে-শুনে আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে। *(আলে ইমরানঃ ৭৮)*

এ আয়াতে ইয়াহুদীদের সেই লোকেদের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, যারা আল্লাহর কিতাবের (তাওরাতের) মধ্যে কেবল হেরফের ও পরিবর্তন সাধনই করেনি, বরং আরো দু'টি অপরাধ করেছে। তার একটি হল, বিকৃত উচ্চারণে মুখ বাঁকিয়ে কিতাব পাঠ করে এবং এ থেকে তারা সাধারণের মধ্যে বাস্তব পরিপন্থী প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়টি হল, তারা তাদের মনগড়া কথাগুলোকে আল্লাহর কথা বলে চালিয়ে দেয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার মযহাবধারী উলামাদের মধ্যেও নবী করীম ﷺ-এর এই উক্তি "তোমরা পূর্ববর্তীদের তরীকার অনুসরণ করবে" অনুযায়ী অনেক এমন লোকও বিদ্যমান রয়েছে, যারা দুনিয়ার স্বার্থে অথবা মযহাবী পক্ষপাতিত্ব কিংবা ফিক্বাহকে বেশী শক্ত ক'রে ধরে থাকার ফলে কুরআন কারীমের সাথেও অনুরূপ আচরণ ক'রে থাকে। তারা কুরআনের আয়াত তো পড়ে; কিন্তু মসলা বয়ান করে নিজেদের মনগড়া। সাধারণ লোক মনে করে যে, মৌলভী সাহেব মসলা কুরআন থেকেই বলছেন। অথচ বর্ণিত মসলার কুরআনের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। আবার কখনো অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে অতি চমৎকার ভঙ্গিমায় পরিবেশন ক'রে এটাই বুঝাতে চেষ্টা করে যে, এ নির্দেশ আল্লাহর পক্ষ হতে! এ থেকে আল্লাহ আমাদেরকে পানাহ দিন। আমীন। *(তাফসীর আহসানুল বায়ান)*

মহান আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতিও সামান্য মূল্যে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল, আল্লাহ তাদের নিকট প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন যে, তোমরা তা (কিতাব) স্পষ্টভাবে মানুষের কাছে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না। এর পরও তারা তা পৃষ্ঠের পিছনে নিক্ষেপ করে (অগ্রাহ্য করে) ও তা স্বল্পমূল্যে বিক্রয় করে। সুতরাং

তারা যা ক্রয় করে তা কত নিকৃষ্ট। *(আলে ইমরানঃ ১৮৭)*

}

( ) {

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে স্বল্প মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না, আর তাদের দিকে চেয়ে দেখবেন না এবং তাদেরকে পরিশুদ্ধও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। *(আলে ইমরানঃ ৭৭)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না। আল্লাহর কাছে তা উত্তম; যদি তোমরা জানতে। *(নাহ্‌লঃ ৯৫)*

পূর্বে উল্লিখিত আয়াতসমূহে 'সামান্য মূল্য' মানে, পদ-মর্যাদা, নেতৃত্ব, পার্থিব সম্পদ ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে। এ সব কিছু পরকালের সম্পদের তুলনায় নেহাতই নগণ্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, বল, 'পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ) ও যুলুম করা হবে না।' *(নিসাঃ ৭৭)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী থাকবে। যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। *(ঐঃ ৯৬)*

সুতরাং তাঁরা কত নীচ, যাঁরা তুচ্ছ মূল্য আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে গ্রহণ করেন!

অর্থের লোভ হলে দাঈকে ধৈর্যধারণ করতে হবে। আর ধৈর্যে আছে মহাপুরস্কার। অপরের ধনৈশ্বর্য দেখেও লোভ করা ঠিক নয়। কারণ আহলে দুনিয়া থেকে আহলে ইল্‌মের দৃষ্টিভঙ্গি পৃথক হবে। কারূনের মাল দেখে দুই শ্রেণীর মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির কথা মহান আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন,

}

( )

( ){

অর্থাৎ, কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।' আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক্ তোমাদের! যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না।' *(ক্বাস্বাসঃ ৭৯-৮০)*

কিন্তু কারো যদি সামর্থ্য না থাকে, তিনি কী করবেন? দূর-দূরান্তে জালসা করতে গিয়ে যে খরচ আছে, সে খরচ বহন করার ক্ষমতা তাঁর নেই। তিনি কি জমি বা স্ত্রীর অলংকার বিক্রি ক'রে সেখানে তাবলীগ বা জালসা করতে যাবেন?

যে দিন কামাই ক'রে যাবেন, সেদিনের তাঁর বেতন কাটা যাবে। বেতনে কোন রকম সংসার চলে। তিনিও কি খরচ ক'রে তাবলীগ ও জালসা করতে যেতে বাধ্য?

এক শ্রেণীর বক্তার বদনাম আছে সমাজে। জালসার দাওয়াতে তাঁরা ফিক্স্‌ড করা ফিস নেন বলে তাঁদের আল্লাহর কালাম বেচে খাওয়া হয়। খেতে পারেন কোন ভাড়াটিয়া বক্তা আল্লাহর কালাম বেচে। খেতে পারেন কেউ বাণীরে বানরী বানিয়ে সমাজকে নাচ দেখিয়ে। তাঁর হিসাব তিনি দেবেন। কিন্তু সমাজ কি নিজের হিসাব দেয়?

যাঁদেরকে জালসার জন্য দূর থেকে আনা হয়, তাঁদের কি যথার্থ কদর করা হয়? চেয়ে না নিলে তাঁদের ক্ষতিপূরণের কথা কি ভাবা হয়?

এক ভক্তিভাজন বক্তাকে সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কেন বাঁধা রেটে জালসা করতে যান? সমাজ রাহাখরচ হিসাবে যা দেয়, তা নিয়েই সন্তুষ্ট হন না কেন?'

তিনি উত্তরে যা বললেন, তার অর্থ হল এই যে, যদি সমাজ যা দেয়, তাই নেওয়া হয় এবং চেয়ে নিজের রাহাখরচ না নেওয়া হয়, তাহলে তো 'মাগ বেচে বেটির বিয়ে দেওয়া'র মত ব্যাপার হবে। পারবেন না আপনি চলতে। সমাজের দেওয়ার মত ক্ষমতা না থাকলে স্থানীয় বক্তা নিয়েই দাওয়াতের কাজ করতে পারে। কোন মসজিদ বা মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে জালসা করালে এবং দূর থেকে বক্তা ডাকতেই হলে বক্তাকে তক্তা বানিয়ে ছাড়লে তো হবে না।

তিনি আরও বললেন, 'এক গ্রামে জালসার দাওয়াত ছিল। আমিই

ছিলাম প্রধান বক্তা। সেদিন আমাদের লাইনের বাস-ধর্মঘট। ডেট ফেল করলেও সমাজের সমালোচনা ও গালাগালির শিকার। নিরুপায় হয়ে ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে পৌঁছলাম সেখানে। বিদায়ের সময় আমাকে রাহাখরচ হিসাবে যা দেওয়া হল, তাতে অর্ধেক ভাড়াও হয় না।'

আমার নিজেরও অভিজ্ঞতা আছে অনেক। ১০০কিমি. দূরের এক জায়গায় জালসা করতে গেলাম। জালসা ক'রে রাতে গৌড় এক্সপ্রেস ধরে মাদ্রাসার ফিরে সকালে ক্লাস ধরব। বিদায়ের সময় জালসা-কমিটির প্রধান রাতের আবছা অন্ধকারে এক গোছা নোট আমার পকেটে গুঁজে দিয়ে বিদায় দিলেন। মনে মনে খোশ ছিলাম। কিন্তু নির্জনে পকেট থেকে গোছা বের ক'রে দেখি, সব ১/২ টাকার নোট। তাতে মাত্র বত্রিশ টাকা? তাতে কি রাহাখরচটাও হয়?

সঊদী আরবের অফিসের জালসায় বাইরে গেলে রাহাখরচ কেবল গাড়ি ও প্লেন-ভাড়া পাওয়া যায়। কোন অফিস দেয়, কোন অফিস 'সাবীলিল্লাহ' ভেবে দেয় না।

এক অফিসের জালসায় গেলাম গাড়ি ভাড়া ক'রে। বিদায়ের সময় ম্যানেজার সাদা জলের বিদায়ী সালাম জানালেন। নির্লজ্জের মত আমি বললাম, 'শায়খ গাড়ি ভাড়া ক'রে এসেছি, গাড়ির ড্রাইভারকে ওর ভাড়াটা মিটিয়ে দিন।'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, 'ই'মাল লিল্লাহ।' (আল্লাহর জন্য কাজ কর। পয়সা কেন চাচ্ছ?)

ড্রাইভার বলল, 'নাহনু না'মালু লিল্লাহ। অআন্তা আ'ত্বি লিল্লাহ।' (আমরা আল্লাহর জন্য কাজ করছি, আপনিও আল্লাহর জন্য দেন।')

তারপর তিনি সে ভাড়া বের করতে অনেক মুখ বাঁকিয়ে ছিলেন।

৬০০ কিমি. দূরের এক শহরে জালসার দাওয়াত। প্লেনে যাওয়া যায়। কিন্তু তাতে সময় বেশী যায়। আমার ম্যানেজার একটি ভাড়া গাড়ি ঠিক ক'রে দিলেন ৫০০ রিয়ালে। সে নিয়ে যাবে ও সাথে ক'রে মাজমাআহ ফিরিয়ে আনবে। ৫/৬ ঘন্টার সফর। পথিমধ্যে দুপুরের খাবার খেতে হল। জালসা এশার পরে। সেখানে ভাত খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। উপস্থিত প্রত্যেক শ্রোতার হাতে একটি প্যাকেটে একটি ক'রে কলা ও একটি ক'রে আপেল বিতরণ করা হল। তারা সকলে বিদায় হয়ে গেল। আমি খাবারের অপেক্ষায় থাকলাম। কেউ খাবারের কথা জিজ্ঞাসাও করল না। সেখানকার দায়িত্বশীল বাঙালী দাঈ ছিলেন না, বিধায় কদরে ত্রুটি হল। বিদায়ের সময় আমার হাতে একটি বন্ধ খাম দেওয়া হল। ১০০ কিমি. দূরে গিয়ে এক হোটেলে খেতে গিয়ে

খাম খুলে দেখি, তাতে মাত্র ৩০০ রিয়াল আছে। এখন বলুন, কী করার ছিল?

৭০০ কিমি. দূরের এক শহরে জালসায় প্লেনে যাওয়া যায়। প্লেনে গেলে তার টিকিট সেখানকার অফিস দেয়। গাড়িতে গেলে ভাড়া দেয়। কিন্তু নিজের গাড়িতে গেলে কেবল পেট্রল-খরচ দেয়!

গতবারে প্লেন ও আনুষঙ্গিক খরচ ৭০০ রিয়াল দিয়েছে। এবারে গাড়ি ভাড়া ক'রে গেছি। পথেরও খরচ আছে। ভাড়া চাওয়ার সময় ম্যানেজার পেট্রল খরচ দিচ্ছেন।

সেখানকার দাঈ দ্বারা জানতে পারলেন, গাড়ি আমার নয়। তবুও তিনি বিশ্বাস করলেন না। ড্রাইভারকে ডেকে তার গাড়ির লাইসেন্স পর্যন্ত পরীক্ষা ক'রে দেখলেন যে, গাড়ি আমার নয়। তা সত্ত্বেও তিনি সন্তুষ্ট-চিত্তে ন্যায্য ভাড়াটি দিলেন না।

কত বিষয়ে কত হাজার হাজার রিয়াল ব্যয় হয়ে যায়, কিন্তু এই 'ধর্মের ষাঁড়'দের পিছনে খরচ করতে সমাজের বড় কষ্ট হয়। আর খরচ করার পরে তাঁদের কৈফিয়তী সমালোচনাও হয়!

নেক আমল

দাঈ অথচ তার নেক আমল নেই, তা কি হয়? মহান আল্লাহ যে বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, 'তোমরা কাজ করতে থাক। অচিরেই তোমাদের কার্যকলাপ আল্লাহ দেখবেন, এবং তাঁর রসূল ও বিশ্বাসিগণও দেখবে। আর অচিরেই তোমাদেরকে অদৃশ্য ও প্রকাশ্য বিষয়ের জ্ঞাতা (আল্লাহর) দিকে প্রত্যাবর্তিত করা হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের সকল কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন।' *(তাওবাহ ঃ ১০৫)*

চারটি কাজ না করলে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, তার মধ্যে একটি হল নেক আমল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) ( ) }

( ) {

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। *(আস্র ঃ ১-৩)*

নেক আমল করলে মানুষের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি হবে। আর তা

দাওয়াতের কাজে সহযোগী হবে বড়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম দয়াময় তাদের জন্য (পারস্পরিক) সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন। *(মারয়্যাম ঃ ৯৬)*

আমল না থাকলে ইলমের কি কোন দাম আছে? জ্ঞানীরা বলেছেন,

'মানুষের জ্ঞান প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়া লোকেদের প্যারাশুটের মত, তা না খুললে কোন লাভ নেই।'

'মুনাফিকের ইল্ম তার মুখে এবং মু'মিনের ইল্ম তার আমলে।'

'জ্ঞান অর্জন খাদ্য গ্রহণের মত; কতটা খাওয়া হচ্ছে তার উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে না---কতটা হজম হচ্ছে তার উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে।'

'দুই ব্যক্তি চরম কষ্ট ও পরিশ্রম করে অথচ তাতে নিজে উপকৃত হয় না; প্রথম হল সেই ব্যক্তি, যে ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করে অথচ (কার্পণ্য ক'রে) নিজে খায় না। আর দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা ক'রে তার আলোকে নিজের জীবনের অন্ধকার দূরীভূত করতে পারে না।' *(সা'দী)*

'যত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হোক না কেন, যদি তার দ্বারা সে নিজে উপকৃত না হতে পারে, তবে এমন শিক্ষিতকে "মূর্খ" বলে আখ্যায়ন করলে অন্যায় হবে না।' *(সা'দী)*

'শিক্ষা করেও যে তার অপপ্রয়োগ করল, সে যেন সুখের সামগ্রী জমা ক'রে অগ্নিদাহ করল।' *(সা'দী)*

'যে আলেম অথচ তার ইল্ম অনুযায়ী আমল নেই, তার উপমা হল একজন এমন অন্ধ, যে রাতের অন্ধকারে হাতে প্রদীপ নিয়ে পথ হাঁটে।' *(সা'দী)*

'বেআমল আলেম, যেমন বিনা মধুর মৌচাক।' *(সা'দী)*

'যে ইল্ম শিখল অথচ তদনুযায়ী আমল করল না, সে সেই চাষীর মত, যে জমিতে চাষ দিল এবং তাতে কোন কিছু রোপন করল না।' *(সা'দী)*

'বিদ্যার সাথে সম্পর্কহীন জীবন অন্ধ এবং জীবনের সাথে সম্পর্কহীন বিদ্যা পঙ্গু।'

'তোমার জ্ঞান ও শিক্ষা যদি তোমাকে অসঙ্গত কর্মে বাধা দেয়, তাহলেই তুমি একজন জ্ঞানী ও শিক্ষিত মানুষ।'

দাঈর ভিতর-বাহির সমান হবে। তার কর্ম তার বক্তৃতার সত্যায়ন করবে। ইল্ম ও নসীহত অনুযায়ী আমল করবে। তবেই তার দাওয়াত মানুষের মাঝে গ্রহণযোগ্য হবে।

যিনি আলেম, তিনি জানেন। আর জেনে-শুনে উল্টা কাজ করলে আল-কুরআনে তাঁর মতো বেআমল কিতাব-জানা লোককে কুকুর ও গাধার সাথে

তুলনা করা হয়েছে!

}

( )

( ) {

অর্থাৎ, তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মত, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। *(আ'রাফঃ ১৭৫-১৭৬)*

}

( ) {

অর্থাৎ, যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(জুমআহঃ ৫)*

আদর্শবক্তা

দাঈকে আদর্শ হতে হবে। যে ব্যক্তি অপরকে ভাল কাজের আদেশ দেবে ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করবে, সবার আগে সেই ব্যক্তির তা পালন করা জরুরী। নচেৎ তা অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না।

'রক্ষক যদি ভক্ষক হয় কে করিবে রক্ষা,
ধার্মিক যদি চুরি করে, কে দিবে তারে শিক্ষা?'

আলী ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজেকে জনসাধারণের ইমাম বা নেতা মনে করে তার উচিত, অপরকে শিক্ষা দেওয়ার পূর্বে নিজেকে শিক্ষা দেওয়া

এবং মুখের দ্বারা আদব দেওয়ার পূর্বে কর্ম, আচরণ ও চরিত্র দ্বারা আদব দান করা।'

আরবী কবি বলেন,

...

অর্থাৎ, এমন কোন সদাচরণে লোককে আদেশ দিও না, যা তুমি নিজে কর না। কারণ, তা করা তোমার জন্য বড় লজ্জাকর ব্যাপার।

অতএব বক্তার বক্তৃতা সব সময়ই কাজের ফলশ্রুতি হওয়া উচিত।

আলী ﷺ বলেন, 'আমল না থাকলে বক্তার কোন মঙ্গল নেই। তুমি যদি বক্তা হও অথচ আলেম না হও, তাহলে তোমার উদাহরণ হল সেই পা; যার জুতা নেই। আর তুমি যদি আলেম হও এবং আমল না কর, তাহলে তুমি হলে সেই জুতার মতো; যার ব্যবহারের পা নেই।'

ইবনুল জাওযীকে এক ব্যক্তি বলল যে, 'আগামী জুমআয় আপনি দাসমুক্তির ফযীলতের উপর খুতবা দিন।' কিন্তু তিনি আগামী সপ্তাহে না দিয়ে দিলেন একমাস পরে। লোকটি বলল, 'এত দেরী করার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'আমার নিকট অর্থ ছিল না। একমাস ধরে অর্থ জমা ক'রে একটি দাস মুক্ত ক'রে তারপর আজ এই খুতবা দিলাম। তাতে আমি যা করি না, তা বলতে হলো না।'

আলী ﷺ বলেন, 'তুমি তার মত হয়ো না, যে বিনা আমলে পরকালের সুখ আশা করে এবং দীর্ঘ কামনার জন্য তওবায় দেরী করে। দুনিয়া সম্বন্ধে বৈরাগীর মত কথা বলে, অথচ কাজ করে দুনিয়াদারের মত। পার্থিব সম্পদ পেলে তুষ্ট হয় না, না পেলে বিষয়-তৃষ্ণা মিটে না। মানুষকে সেই কথার উপদেশ দেয়, যা সে নিজে পালন করে না। নেক লোকদের ভলোবাসে, কিন্তু তাদের মত আমল করে না। মন্দ লোকদের ঘৃণা করে, অথচ সে তাদেরই একজন। অধিক পাপের জন্য মরণকে ভয় করে এবং যার জন্য মরণকে ভয় করে তাতেই অবিচল থাকে!'

সত্যিই তো বীরের মত প্রতিজ্ঞা আর ভীরুর মত কাজ দেখালে নিজের মূল্য থাকে কোথায়?

বলা বাহুল্য, আমলহীন দাঈর উপমা হল সেই দৃষ্টিহীন লোকের ন্যায়, যে অন্ধকার রাত্রিতে হাতে চেরাগ নিয়ে পথ চলে থাকে।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে ভালো শিক্ষা দেয় এবং নিজেকে ভুলে বসে, সেই ব্যক্তির উদাহরণ একটি (প্রদীপের) পলিতার মত; যে লোকেদেরকে আলো দান করে, কিন্তু নিজেকে জ্বালিয়ে ধ্বংস করে!" *(বায্যার, সহীহ তারগীব ১২৫নং)*

আর আল্লাহর কাছেও তা পছন্দ নয়। তিনি বলেছেন,

{ }

অর্থাৎ, কী আশ্চর্য! তোমরা নিজেদের বিস্মৃত হয়ে মানুষকে সৎকাজের নির্দেশ দাও, অথচ তোমরা কিতাব (গ্রন্থ) অধ্যয়ন কর, তবে কি তোমরা বুঝ না? *(বাক্বারাহঃ ৪৪)*

( ) }

( ) {

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যা কর না, তা বল কেন? তোমরা যা কর না, তোমাদের তা বলা আল্লাহর নিকট অতিশয় অসন্তোষজনক। *(স্বাফঃ ২-৩)*

আর তার জন্যই পরকালে তার বিশেষ শাস্তি রাখা হয়েছে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাতে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বের হয়ে যাবে এবং সে তার চারিপাশে সেইরূপ ঘুরতে থাকবে, যেরূপ গাধা তার চাকির (ঘানির) চারিপাশে ঘুরতে থাকে। এ দেখে দোযখবাসীরা তার আশে-পাশে সমবেত হয়ে বলবে, 'ওহে অমুক! কী ব্যাপার তোমার? তুমি কি আমাদেরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দিতে না?' সে বলবে, '(হ্যাঁ!) আমি তোমাদেরকে সৎকাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু আমি নিজে তা করতাম না, আর মন্দ কাজে বাধা দিতাম; কিন্তু আমি তা নিজে করতাম।" *(বুখারী ৩২৬৭, মুসলিম ২৯৮৯নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমি মি'রাজের রাতে এমন একদল লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেছি যারা আগুনের কাঁইচি দ্বারা নিজেদের ঠোঁট কাটছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে জিবরীল! ওরা কারা?' তিনি বললেন, 'ওরা আপনার উম্মতের বক্তাদল; যারা নিজেরা যা করত না, তা (অপরকে করতে) বলে বেড়াত।" *(আহমাদ ৩/ ১২০ প্রভৃতি, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১২০নং)*

তিনি আরো বলেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত, তা করত না এবং তারা তা করত, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন

এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম)*

কিন্তু যার যে আদেশ ও নিষেধ পালন করার সুযোগ বা ক্ষমতা নেই, সে অবশ্যই তা অপরকে করতে পারে।

যেমন একজন গরীব মানুষ যাকাত দিতে পারে না অথবা দান করতে পারে না, সে অপরকে তা করার জন্য উপদেশ দিতে পারে। অক্ষম ব্যক্তি সক্ষম ব্যক্তিকে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

অনুরূপ কেউ যদি চেষ্টা সত্ত্বেও একান্তই কোন পাপ বর্জন করতে না পারে, তাহলে এ কথা জরুরী নয় যে, সে সেই পাপ বর্জন করতে অপরকে নসীহত করতে পারবে না। নিজে ধ্বংস হয়েছে বলে অপরকে সতর্ক করতে পারবে না, তা নয়। হয়তো বা তার সেই দুরবস্থা দর্শন ক'রে কেউ হিদায়াত পেতে পারে। যেমন কোন ধূমপায়ী অপরকে ধূমপানের শিকার না হতে উপদেশ দিতে পারে। ধৈর্যহীন ব্যক্তি অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দিতে পারে। রাগী ব্যক্তি অপরকে রাগ বর্জন করার নসীহত করতে পারে ইত্যাদি।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ এই দ্বীনকে পাপাচারী দিয়েও সাহায্য করবেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তাছাড়া সৎকর্মের আদেশ ও মন্দ কর্মে বাধা দান করার ব্যাপারে যে সকল নির্দেশ এসেছে, তার সবগুলিই আম নির্দেশ। অর্থাৎ, তাতে এ শর্ত নেই যে, দাঈকে আগে পালন করতে হবে। অবশ্য সাধ্যে কুলালে তা পালন করা তার নৈতিক কর্তব্য।

নচেৎ বেনামাযী অপরকে নামাযের উপদেশ দিলে, তা গ্রহণ যোগ্য হয় না। বেপর্দা অপরকে পর্দার উপদেশ দিলে, তা মানার যোগ্য হয় না। এই স্ববিরোধিতা দেখা যায় বলেই লোকে বলে, 'নিজের চরকায় তেল দাও। আগে ঘর সামলাও, তারপর পরকে বলো। নিজের পানে চায় না শালী, পরকে বলে ডাবড়া-গালী। চালনি বলে ছুঁচ তোর পোঁদে কেন ছ্যাঁদা? কাঁঠাল বলে, আনারস তুমি বড় খসখসে। গুয়ে বলে, গোবর দাদা তোমার ভারি গন্ধ!' ইত্যাদি।

নিজে আদর্শ না হয়ে দাওয়াত ও তারবিয়াত ফলপ্রসূ হয় না। বিশেষ ক'রে বাড়ির ভিতরে মুরুব্বী নারী-পুরুষ যদি পরিবারের লোকের জন্য আদর্শ না হয়, তাহলে তো সাধারণতঃ 'বাপ কা বেটা সিপাহী কা ঘোড়া, কুছ না হো তো থোড়া থোড়া। যেই মতো কোদাল হবে সেই মতো চাপ, সেই মতো বেটা হবে যেই মতো বাপ। মা গুণে বেটি, আটা গুণে রুটি। গাই গুণে ঘি, মা গুণে ঝি। শাশুড়ী যদি দাঁড়িয়ে মুতে, বউ মুতে পাক দিয়ে দিয়ে!' ইত্যাদি।

দাঈ হবেন সর্ব-কল্যাণের ইমাম। তিনি হবেন রহমানের সেই বান্দা, যিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ক'রে বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, যারা (প্রার্থনা ক'রে) বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে আমাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কর এবং আমাদেরকে সাবধানীদের জন্য আদর্শস্বরূপ কর।' *(ফুরক্বান ঃ ৭৪)*

সুতরাং তিনি প্রত্যেক নামাযের প্রথম কাতারে থাকবেন, আগের সুন্নত আগে পড়বেন, সকল সুন্নতের পাবন্দ হওয়ার চেষ্টা করবেন।

নচেৎ তিনি কি দাঈর দায়িত্ব পালন করতে পারবেন, যিনি ফজরের নামায ঘরে পড়েন অথবা সে সময় ঘুমিয়ে থাকেন, যিনি ছোট ক'রে দাড়ি ছাঁটেন, যিনি গান-বাজনা শোনেন, যিনি তাস-কিরামের আড্ডায় বসে থাকেন, যিনি টিভির আসরে জায়গা দখল করেন, যিনি গাঁটের নিচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি-পায়জামা পরেন?

সার্থক দাঈর গুণাবলী

মানুষের সদ্‌গুণ ও চরিত্র মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারের মত। কিছু আছে সতর ঢাকার মতো জরুরী। কিছু আছে আকর্ষণীয় সৌন্দর্য, যে সৌন্দর্য দেখে মানুষ মুগ্ধ হয়ে দাওয়াত গ্রহণ ক'রে থাকে। কেউ সুন্দর হলে অলংকার ও প্রসাধন যেমন তাকে আরো সুন্দর ও আকর্ষণীয় ক'রে তোলে, তেমনি দাঈ আলেম হলেও তার সদ্‌গুণ ও সুন্দর চরিত্র তাকে আরো মহৎ ক'রে তোলে।

যে সকল সদ্‌গুণাবলী দাঈর মধ্যে থাকা প্রয়োজন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় গুণ নিম্নরূপ ঃ-

তাক্বওয়া

দাঈ হবে মুত্তাক্বী, পরহেযগার, সংযমশীল ও সাবধানী। আর তা হতে গেলে মাকরূহ জিনিস থেকে দূরে থাকতে হবে এবং বেশী বেশী নফল ইবাদত করতে হবে। যা সমাজের চোখে দৃষ্টিকটু এবং শরীয়তে তার যুক্তি আছে, তা বর্জন করতে হবে। যেমন একজন দাঈ দাড়ি ছোট করবে না। মস্তানদের মতো চুল রাখবে না, প্যান্ট-শার্ট পরবে না। বেশী কথা বলবে না। খারাপ জায়গায় যাবে না। খারাপ মজলিসে ও রাস্তার ধারে বসবে না। ইত্যাদি।

পরহেযগার মানুষের একটা আকর্ষণ আছে, সেই আকর্ষণ মানুষকে আল্লাহর দিকে আকর্ষণ করবে। যেহেতু পরহেযগার মানুষদের সাথে আল্লাহ থাকেন। তিনি বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে থাকেন, যারা সংযম অবলম্বন করে এবং যারা সৎকর্মপরায়ণ। *(নাহল ঃ ১২৮)*

( ) { }

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ সাবধানীদের সাথী। *(বাক্বারাহ ঃ ১৯৪)*

( ) { }

অর্থাৎ, যারা আমার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহে পরিচালিত করব। আর আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গেই থাকেন। *(আনকাবূত ঃ ৬৯)*

'আল্লাহ সাথে আছেন' দাওয়াতের কাজে এই অনুভূতি থাকলে কোন ভয় থাকে না। বড় জাঁদরেলকেও দাওয়াত দিতে মনে সাহস সঞ্চার হয়। মহান আল্লাহ মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)কে নির্দেশ দিলেন,

( ) }

( ) ( )

( ) { ( )

অর্থাৎ, তুমি ও তোমার ভাই আমার নিদর্শনসমূহসহ যাত্রা শুরু কর এবং আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না। তোমরা দু'জন ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা অবশ্যই আশংকা করি যে, সে আমাদেরকে দ্রুত শাস্তি দিতে উদ্যত হবে অথবা অন্যায় আচরণে সীমালংঘন করবে।' তিনি বললেন, 'তোমরা ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি; আমি শুনি ও দেখি। *(ত্বা-হা ঃ ৪২-৪৬)*

প্রকাশ থাকে যে, 'আমার স্মরণে শৈথিল্য করো না'-এর তফসীরে দু'টি মত রয়েছে ঃ-

প্রথমতঃ তোমরা আমার রিসালাত পৌঁছাতে গাফলতি করো না।

দ্বিতীয়তঃ তোমরা আমার ফরয আদায় করতে এবং তাসবীহ-তাহলীল

করতে ঢিলেমি করো না।

তার মানে এই নয় যে, কাউকে দাওয়াত দিতে গেলে নির্দিষ্ট কোন দুআ বা যিক্র পড়তে হবে। এ ক্ষেত্রে মহান আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ ও তার কাছে তওফীকের দুআ করা যথেষ্ট। এই সময় সমস্বরে যিক্র বা সমবেত মুনাজাত বিদআত।

পক্ষান্তরে যে পরহেযগার নয়, যার কর্মকাণ্ড সংযত নয়, যার জামাআতে সঠিক হাজরি নেই, যে সুন্নতের পাবন্দ নয়, যার মকরূহে পরহেযগারী নেই, তার নিকট থেকে মানুষ দাওয়াত গ্রহণ করে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে। *(কাহফঃ ২৮)*

দুনিয়াদার দাঈর দাওয়াতও গ্রহণযোগ্য হয় না। মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, অতএব তাকে উপেক্ষা ক'রে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। *(নাজমঃ ২৯)*

আর এই কারণেই বাহ্যিক পরহেযগারী দেখে অনেক মানুষ বাতিলপন্থীদের দলে ভিড়ে যায়। শূন্য হৃদয়ে প্রথমে যার স্থান হয়, তাকেই নিজের প্রকৃত 'রাহবার' বলে ধারণা ক'রে নেয়, যদিও সে বাতিলপন্থী।

সুতরাং হকপন্থী দাঈদের উচিত, ভিতর ও বাহির সমান ক'রে উভয় প্রকার পরহেযগারী অবলম্বন করে।

সচ্চরিত্রতা

ইসলাম আক্বীদা, ইবাদত ও আখলাকের নাম। আখলাক অমুসলিমদেরও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু মুসলিমের ইবাদত ও আখলাক আছে, কিন্তু আক্বীদা নেই। আর তার ফলে আপাতদৃষ্টিতে তাদেরকে পাকা মুসলমান বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নয়। অনুরূপ আক্বীদাহীন দাঈকে সত্য দাঈ বলে মনে হলেও, আসলে সে কিন্তু মিসকীন।

পক্ষান্তরে বহু মুসলিমের কাছে আক্বীদা ও ইবাদত আছে, কিন্তু তাদের আখলাক নেই। মুসলিম-অমুসলিম তথা সৃষ্টির সাথে যথোচিত সুন্দর ব্যবহার তারা প্রদর্শন করতে পারে না। আক্বীদায় ও ইবাদতে হিরো, কিন্তু

চরিত্র ও ব্যবহারে জিরো। আর তার ফলেও দাঈ নিজের দাওয়াতে অসফল থেকে যায়।

চরিত্রে দাগ থাকলে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না অনেক অবিবেচক মানুষের নিকট। মূসা ﷺ ফিরআউনের নিকট দাওয়াতের জন্য গেলে সে তাঁকে বলল,

( ) }

( ) ( )

( ) {

অর্থাৎ, 'আমরা কি তোমাকে শিশু অবস্থায় আমাদের তত্ত্বাবধানে লালন-পালন করিনি এবং তুমি কি তোমার জীবনের বহু বছর আমাদের মধ্যে কাটাও নি? তুমি তো যা অপরাধ করার তা করেছ, আর তুমি হলে অকৃতজ্ঞ।' মূসা বলল, 'আমি সে অপরাধ করেছিলাম, যখন আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। অতঃপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম, তখন আমি তোমাদের নিকট থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমার প্রতিপালক আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং আমাকে রসূল করেছেন। *(শুআরা' ১৮-২১)*

সুন্দর চরিত্র মানুষের মনে দাগ কাটে। চরিত্রে সততা থাকলে মানুষের আগ্রহ পাওয়া যায়। সত্যবাদী হলে মানুষ তার কথায় বিশ্বাস রাখে। আমানতদার হলে মানুষ তার ওপর ভরসা রাখে।

মহানবী ﷺ নবুঅতের পূর্বে 'আল-আমীন' (আমানতদার) নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, সত্যবাদিতায় খ্যাত ছিলেন। তার জন্য তাঁর দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হয়েছে। তিনি ছিলেন সারা সৃষ্টির জন্য রহমত। তাঁর জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের নিকট আগমন করেছে তোমাদেরই মধ্যকার এমন একজন রসূল, যার কাছে তোমাদের ক্ষতিকর বিষয় অতি কষ্টদায়ক মনে হয়, যে তোমাদের খুবই হিতাকাঙ্ক্ষী, মু'মিনদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল, করুণাপরায়ণ। *(তাওবাহঃ ১২৮)*

দাঈকে হওয়া উচিত তাঁর মতো, তাহলে তার দাওয়াত সফল হবে।

লজ্জাশীল হলে মানুষ দাঈকে শ্রদ্ধা করে। ভদ্র হলে মানুষ তাকে সম্মান দেয়। গম্ভীর হলে মানুষ তাকে মান্য করে। দানশীল হলে মানুষ তার কৃতজ্ঞ হয়। গোঁড়া না হয়ে উদার হলে মানুষ তাকে ভালবাসে। ক্ষমাশীল হলে মানুষের কাছে তার মর্যাদা বাড়ে। আত্মসম্মানবোধ থাকলে মানুষের কাছে

ভক্তি পাওয়া যায়। হাসিমুখ থাকলে মানুষের কাছে আপন হওয়া যায়।

প্রগল্‌ভ হলে মানুষের কাছে তার ওজন হাল্কা হয়ে যায়। লোভী হলে মানুষের কাছে ছোট হয়ে যায়। উদরপরায়ণ হলে মানুষের কাছে উপহাসের পাত্র হয়। অহংকার বা গর্ব থাকলে মানুষের কাছে ঘৃণ্য হয়ে যায়। আত্মপ্রশংসা করলে মানুষের চোখে তুচ্ছ হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। তিনিই সম্যক জানেন আল্লাহভীরু কে। *(নাজমঃ ৩২)*

হালাল রুযীর খেয়াল রাখলে এবং হারাম রুযী থেকে দূরে থাকলে মানুষের কাছে নির্ভরযোগ্যতা লাভ হয়। হারাম রুযী খেলে সেই দাঈ আল্লাহর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! নিশ্চয় অনেক পন্ডিত-পুরোহিত মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায় উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। *(তাওবাহঃ ৩৪)*

দুনিয়াদার হলেও দাওয়াতের পথে বাধা পড়ে। মহান আল্লাহর বাণীতে সে কথার ইঙ্গিত রয়েছে,

}

( ) {

অর্থাৎ, যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। *(ইব্রাহীমঃ ৩)*

দাওয়াতের ভাষায় থাকবে মধুরতা, সুভাষিতা, কর্কশহীনতা। ব্যবহারে থাকবে দয়ার্দ্রতা, বিনয় ও নম্রতা।

যারা বড় তাদেরই বিনয় ফলপ্রদ। যে যত বড় হবে, সে তত বিনয়ী হবে, আর তাতেই দাওয়াতের কাজ সহজ ও সুন্দর হবে।

বিনয়ী হলে কেউ মানুষের নিকট ছোট হয়ে যায় না। আরবী কবি বলেন,

...

...

অর্থাৎ, বিনয়ী হও, তাহলে তুমি সেই তারকার মত হবে, যে পানির ওপরে দর্শকের দৃষ্টিতে জ্বলজ্বল করে, অথচ সে থাকে বহু উপরে। আর ধোঁয়ার মতো হয়ো না, যে নিজেকে মহাকাশের দিকে তোলে, অথচ সে নীচ।

সুতরাং আদেশ ও নিষেধে বিনম্র হতে হবে দ্বীনের দাঈকে। তা না হলে দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না। বিশেষ ক'রে যে সকল মানুষের কাছে দাঈ শ্রদ্ধাভাজন নয়, তাদের কাছে গরম হওয়ার জায়গায় নরম হওয়া বড়ই উপকারী।

আমাদের নবী ﷺ সে রকমই ব্যবহারের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করেছেন এবং মহাকল্যাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। মহান আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, আল্লাহর দয়ায় তুমি তাদের প্রতি হয়েছিলে কোমল-হৃদয়; যদি তুমি রূঢ় ও কঠোর-চিত্ত হতে, তাহলে তারা তোমার আশপাশ হতে সরে পড়ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। আর কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। অতঃপর তুমি কোন সংকল্প গ্রহণ করলে আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর। নিশ্চয় আল্লাহ (তাঁর উপর) নির্ভরশীলদের ভালবাসেন। *(আলে ইমরানঃ ১৫৯)*

যেমন তিনি মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)কে বলেছিলেন,

{ ( ) }

অর্থাৎ, তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। *(ত্বাহাঃ ৪৪)*

বাদশা মামূনের নিকট এক ওয়াযকারী কঠোর ভাষায় তাঁকে ওয়ায-নসীহত করতে শুরু করলে তিনি তার উদ্দেশ্যে বললেন, 'হে অমুক! নম্রভাবে কথা বলুন। আল্লাহ তাআলা আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি (মূসা ও হারূন)কে আমার চেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ (ফিরআউন)এর নিকট পাঠিয়ে তাঁদেরকে নম্রভাবে কথা বলতে আদেশ দিয়েছিলেন।'

সুতরাং ফিরআউন না হলে মানুষের হৃদয়ের নম্রতা ও বিনয়ের প্রভাব পড়বেই পড়বে। এ ব্যাপারে বহু নির্দেশ রয়েছে হাদীসসমূহে।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা কোমল; তিনি প্রত্যেকটি ব্যাপারে কোমলতা ও নম্রতাকে

প্যান্ট্-শার্ট পরে এসেছে, ওকে মাদ্রাসা থেকে বের ক'রে দাও।
চুল বড় রেখে কেটেছে, ওকে নেড়া ক'রে দাও।
হাঁটুর নিচে পাঞ্জাবী না হলে দলে থাকা যাবে না।
ইত্যাদি আরও কত 'লঘু পাপে গুরু দণ্ড' দিয়ে অনেককে ইসলাম-বিমুখ ক'রে দেওয়া হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আমাকে আল্লাহ নিজের ব্যাপারে ও অপরের ব্যাপারে কঠোর ক'রে পাঠাননি। বরং তিনি আমাকে সরল শিক্ষক ক'রে পাঠিয়েছেন।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না এবং (লোকেদেরকে) সুসংবাদ দাও। তাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করো না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঈদের দিন আল্লাহর রসূল ﷺ আমার নিকট এলেন। সেই সময় আমার কাছে দুটি কিশোরী 'দুফ' বাজিয়ে বুআষ (যুদ্ধের বীরত্বের) গীত গাচ্ছিল। অবশ্য তারা গায়িকা ছিল না। তা দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। অতঃপর তিনি কাপড় ঢাকা দিয়ে বিছানায় শুয়ে গেলেন। ইত্যবসরে আবূ বাকর ﷺ প্রবেশ করলেন এবং আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'শয়তানের সুর আল্লাহর রসূলের কাছে?' (এ কথা শুনে) আল্লাহর রসূল ﷺ নিজ চেহারা খুলে আবূ বাকরের দিকে ঘুরে বললেন, "ওদেরকে ছেড়ে দাও, হে আবূ বাকর। আজ তো ঈদের দিন। প্রত্যেক জাতির ঈদ আছে। আর আজ হল আমাদের ঈদ।" অতঃপর তিনি একটু অন্যমনস্ক হলে আমি তাদেরকে চলে যেতে ইঙ্গিত করলাম। তখন তারা বেরিয়ে গেল। *(বুখারী ৯৪৯, মুসলিম ৮৯২নং)*

রাগের কথায় রাগ করা ভাল। তবে রাগ নিয়ন্ত্রণ করা আরও ভাল। রাগের কথায় না রেগে ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করলে বিদ্যুতের মত কাজ হয়।

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন!' তিনি বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" সে ব্যক্তি এ কথাটি কয়েকবার বলল। তিনি (প্রত্যেক বারেই একই কথা) বললেন, "তুমি রাগান্বিত হয়ো না।" *(বুখারী)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুশ্তিগীর বীর সে নয়, যে প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিৎপাত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে বীর সেই, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

যারা ভুল করে, তাদের প্রতি রাগ না ক'রে তাদের ভুল সংশোধনের জন্য কী করা উচিত? তাতেও নমুনা রয়েছে নববী আদর্শে।

ভালবাসেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "নিশ্চয় মহান আল্লাহ নম্র, তিনি নম্রতাকে ভালবাসেন। তিনি নম্রতার উপরে যা দেন তা তিনি কঠোরতা এবং অন্য কোন জিনিসের উপর দেন না।" *(মুসলিম)*

"নম্রতা যে জিনিসেই থাকে, তাকে তা সুন্দর বানিয়ে দেয় এবং তা যে জিনিস থেকেই বের করে নেওয়া হয়, তাকে তা অসুন্দর বানিয়ে দেয়।" *(মুসলিম)*

"যাকে নম্রতা থেকে বঞ্চিত করা হয়, তাকে সমস্ত মঙ্গল থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়।" *(মুসলিম)*

"আমি কি তোমাদেরকে সে সমস্ত লোক সম্পর্কে বলব না, যারা জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম অথবা যাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম? এ (আগুন) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য হারাম হবে, যে মানুষের নিকটবর্তী, বিনম্র, সহজ ও সরল।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

কর্কশ ও অশ্লীলভাষী এবং গপে লোকের দাওয়াত সফল নয়। যেহেতু তা সচ্চরিত্রতার নিদর্শন নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ (প্রকৃতিগতভাবে কথা ও কাজে) অশ্লীল ছিলেন না এবং (ইচ্ছাকৃতভাবেও) অশ্লীল ছিলেন না। আর তিনি বলতেন, "তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম, যে তোমাদের মধ্যে সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি বলেন, "কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে অপছন্দ করেন।" *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

"তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা; যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী, হাসান)*

কথা এমনভাবে বলতে হবে, যাতে মানুষের মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি না হয়। কাজ এমন দেখাতে হবে, যাতে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি বিকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। ইসলামকে কঠিন ক'রে পেশ করা অভিজ্ঞ দাঈর কাজ নয়।

কঠোরতা ও অতিরঞ্জন ইসলামে নিন্দনীয়।

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, এক বেদুঈন মসজিদের ভিতরে প্রস্রাব ক'রে দিল। সুতরাং লোকেরা তাকে ধমক দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। নবী ﷺ বললেন, "ওকে ছেড়ে দাও এবং প্রস্রাবের উপর এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়েছে, কঠোর নীতি অবলম্বন করার জন্য পাঠানো হয়নি।" *(বুখারী)*

মুআবিয়া ইবনে হাকাম সুলামী ؓ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি (একবার) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নামায পড়ছিলাম। ইত্যবসরে হঠাৎ একজন মুক্তাদীর ছিঁক (হাঁচি) হলে আমি (তার জবাবে) 'য়্যারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বললাম। তখন অন্য মুক্তাদীরা আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগল। আমি বললাম, 'হায়! হায়! আমার মা আমাকে হারিয়ে ফেলুক! তোমাদের কী হয়েছে যে, তোমরা আমার দিকে তাকিয়ে দেখছো?' (এ কথা শুনে) তারা তাদের নিজ নিজ হাত দিয়ে নিজ নিজ উরুতে আঘাত করতে লাগল। তাদেরকে যখন দেখলাম যে তারা আমাকে চুপ করাতে চাচ্ছে (তখন তো আমার অত্যন্ত রাগ হয়েছিল); কিন্তু আমি চুপ হয়ে গেলাম। অতঃপর আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায সমাপ্ত করলেন---আমার পিতা-মাতা তাঁর জন্য কুরবান হোক, আমি তাঁর চেয়ে উত্তম শিক্ষাদাতা না আগে দেখেছি আর না এর পরে। আল্লাহর শপথ! তিনি না আমাকে তিরস্কার করলেন, আর না আমাকে মারধর করলেন, আর না আমাকে গালি দিলেন---তখন তিনি বললেন, "এই নামাযে লোকেদের কোন কথা বলা বৈধ নয়। (এতে যা বলতে হয়,) তা হল তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠ।" অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই মত কোন কথা বললেন। আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জাহেলিয়াতের লাগোয়া সময়ের (নও মুসলিম)। আল্লাহ ইসলাম আনয়ন করেছেন। আমাদের মধ্যে কিছু লোক গণকের কাছে (অদৃষ্ট ও ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যাবে না।" আমি বললাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক অশুভ লক্ষণ গ্রহণ ক'রে থাকে।' তিনি বললেন, "এটা এমন একটি অনুভূতি, যা লোকেরা নিজেদের অন্তরে উপলব্ধি ক'রে থাকে। সুতরাং এই অনুভূতি তাদেরকে যেন (বাঞ্ছিত কর্ম সম্পাদনে) বাধা না দেয়।" *(মুসলিম)*

আনাস ؓ বলেন (একদা) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। সে সময় তাঁর উপর মোটা-পেড়ে একখানি নাজরানী চাদর ছিল। অতঃপর পথে এক বেদুঈনের সঙ্গে দেখা হল। সে তাঁর চাদর ধরে খুব জোরে টান দিল। আমি নবী ﷺ-এর কাঁধের এক পাশে দেখলাম যে, খুব

জোরে টানার কারণে চাদরের পাড়ের দাগ পড়ে গেছে। পুনরায় সে বলল, 'ওহে মুহাম্মাদ! তোমার নিকট আল্লাহর যে মাল আছে, তা থেকে আমাকে দেওয়ার আদেশ কর।' তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসলেন। অতঃপর তাকে (কিছু মাল) দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অসভ্য লোকেদের অসভ্যতার জবাবে কী করা উচিত, সে ব্যাপারে আমাদের মহানবী ﷺ মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা ক'রে গেছেন। তিনি এক ব্যক্তির নিকট ঋণী ছিলেন। লোকটি ঋণ আদায় করতে এসে মহানবী ﷺ কে কর্কশ ভাষায় কটু কথা শুনাতে শুরু ক'রে দিল। তা দেখে সাহাবীগণ তাকে (ধমক দিয়ে) বাধা দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ বললেন, "হকদারের কথা বলার অধিকার আছে। তোমরা ওর ঋণ শোধ ক'রে দাও।" *(মুসলিম ১৬০১, আহমাদ)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক মরুবাসী (বেদুঈন) লোকের কাছে তিনি কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবীগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জানো, তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।' মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?" অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, "যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ ক'রে দেব।" খাওলাহ বললেন, 'অবশ্যই দোব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!' অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, 'আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।' মহানবী ﷺ বললেন, "ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বায্যার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

অভদ্র ব্যবহারের প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিশোধ না নিলেও দাওয়াতের কাজ ভাল হয়। এ ব্যাপারেও আদর্শ হলেন আমাদের মহানবী ﷺ।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যখনই দু'টি

কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেওয়া হত, তখনই তিনি সে দু'টির মধ্যে সহজ কাজটি গ্রহণ করতেন; যদি সে কাজটি গর্হিত না হত। কিন্তু তা গর্হিত কাজ হলে তিনি তা থেকে সকলের চেয়ে বেশি দূরে থাকতেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনই কোন বিষয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু (কেউ) আল্লাহর হারামকৃত কাজ ক'রে ফেললে তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) একদা নবী ﷺ-কে বললেন, 'আপনার উপর কি উহুদের দিনের চেয়েও কঠিন কোন দিন এসেছে?' তিনি বললেন, "আমি তোমার কওম থেকে বহু কষ্ট পেয়েছি এবং সবচেয়ে বেশি কষ্ট আক্বাবার দিন পেয়েছি, যেদিন আমি নিজেকে ইবনে আব্দে ইয়ালীল ইবনে আব্দে কুলাল (ত্বায়েফের এক বড় সর্দার)এর উপর (ইসলামের দিকে আহবান করার জন্য) পেশ করেছিলাম। সে আমার দাওয়াত গ্রহণ করল না। সুতরাং আমি চিন্তিত হয়ে চলতে শুরু করলাম। তারপর 'ক্বারনুষ ষাআলিব' (বর্তমানে সাইল কাবীর) নামক স্থানে পৌঁছলে সেখানে কিছু স্বস্তি অনুভব করলাম। আমি (আকাশের দিকে) মাথা উঠিয়ে দেখতে পেলাম যে, একটা মেঘখন্ড আমার উপর ছায়া ক'রে আছে। অতঃপর গভীর দৃষ্টিতে দেখলাম তো তাতে জিব্রাঈল ﷺ রয়েছেন। তিনি আমাকে ডেকে বললেন, 'আপনার কউম আপনাকে যে কথা বলল এবং তারা আপনাকে যে জবাব দিল, তা সবই মহান আল্লাহ শুনেছেন। অতঃপর তিনি আপনার নিকট পর্বতমালার ফিরিশ্তাকে পাঠিয়েছেন, যেন আপনি তাঁকে তাদের (ত্বায়েফবাসীদের) ব্যাপারে যা ইচ্ছা আদেশ দেন।' অতঃপর পর্বতমালার ফিরিশ্তা আমাকে আওয়াজ দিলেন এবং আমাকে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার কওম আপনাকে যা বলেছে, তা (সবই) মহান আল্লাহ শুনেছেন। আমি হচ্ছি পর্বতমালার ফিরিশ্তা। আমার প্রভু আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন, যেন আপনি আমাকে তাদের ব্যাপারে (কোন) নির্দেশ দেন। সুতরাং আপনি কী চান? আপনি চাইলে, আমি (মক্কার) বড় বড় পাহাড় দু'টিকে তাদের উপর চাপিয়ে দেব।' (এ কথা শুনে) নবী ﷺ বললেন, "(এমন কাজ করবেন না) বরং আমি আশা করছি যে, মহান আল্লাহ তাদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যারা এক আল্লাহর উপাসনা করবে এবং তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করবে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমি যেন (এখনো) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নবীদের মধ্যে এক নবীর ঘটনা বর্ণনা করতে দেখছি, তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে

রক্তাক্ত ক'রে দিয়েছে, আর তিনি তাঁর চেহারা থেকে রক্ত মুছছেন এবং বলছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা ক'রে দাও। কেননা তারা অজ্ঞ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কিন্তু মানুষ খারাপ হলে?

প্রয়োজনে তর্ক করতে হলে সবচেয়ে উত্তম পন্থায় করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত। *(নাহলঃ ১২৫)*

কেউ অত্যাচারী ও হঠকারী হলে, তার সাথে অন্য উচিত পথ অবলম্বন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, সৌজন্যের সাথে ছাড়া তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান)দের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করো না; তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী, তাদের সাথে (তর্ক) নয়। *(আনকাবূতঃ ৪৬)*

ছোটখাটো বিষয় নিয়ে তর্কে জড়িয়ে পড়া উচিত নয়। আর "কুরআন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করা কুফ্র।" *(সহীহুল জামে' ৩১০১)*

তর্কপ্রিয় মানুষ ভাল নয়। মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অত্যধিক ঝগড়াটে ও অত্যন্ত কলহপ্রিয়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

বিশেষ ক'রে অজ্ঞ ও গোঁড়া মানুষদের সাথে তর্ক ক'রে কোন ফল নেই। কারণ, তারা তর্ক করতে গিয়ে এমন কথা বলে বসবে, যাতে আল্লাহ, নবী, কুরআন বা হাদীসের শানে বেআদবী হবে। ফলে হিতে-বিপরীত হয়ে উদ্দেশ্য বিফল যাবে।

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমরা উলামাদের মাঝে গর্ব করা, অজ্ঞদের সাথে তর্ক করা এবং (প্রসিদ্ধ) মজলিস লাভ করার উদ্দেশ্যে ইল্ম শিক্ষা করো না। যে ব্যক্তি তা করে (তার জন্য) জাহান্নাম, জাহান্নাম।" *(সহীহ তারগীব ও তারহীব, সহীহ ইবনে মাজাহ ১/৪৬)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, 'তিন উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না; মূর্খদের সাথে বিতর্ক, উলামাদের সাথে বিতন্ডা এবং নিজেদের দিকে মানুষের মুখ

ফিরাবার উদ্দেশ্যে। তোমাদের কথা দ্বারা আল্লাহর নিকট যা আছে তা কামনা কর। কারণ সেটাই চিরস্থায়ী ও অবশিষ্ট থাকবে এবং তাছাড়া সব কিছুই নিঃশেষ হয়ে যাবে।” *(দারেমী ১/৭০)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “সৎপথে থাকার পর যে সম্প্রদায়ই ভ্রষ্ট হয়েছে তাকে প্রতর্ক দেওয়া হয়েছে।” অতঃপর তিনি আল্লাহর এই বাণী পাঠ করলেন, “এরা কেবল বাগ্‌বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে, বস্তুতঃ এরা এক বাগ্‌বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।” *(সূরা যুখরুফ ৫৮, মুসনাদ আহমদ ৫/২৫২, ইবনে মাজাহ ১/১৯, সহীহ তিরমিযী ৩/১০৩)*

এই জন্য যথা সম্ভব তর্ক এড়িয়ে চলা কর্তব্য। বিশেষ ক'রে শুষ্ক তর্ক করা মোটেই উচিত নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের শেষ সীমায় একটি ঘর দেওয়ার জন্য জামিন হচ্ছি, যে সত্যাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও কলহ-বিবাদ বর্জন করে। সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের মধ্যস্থলে একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে উপহাসছলেও মিথ্যা বলা বর্জন করে। আর সেই ব্যক্তির জন্য আমি জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি ঘরের জামিন হচ্ছি, যে নিজ চরিত্রকে সুন্দর করে।” *(আবূ দাঊদ)*

নসীহত কাজে দিলে নসীহত প্রয়োগ করতে হবে। নচেৎ উলু বনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কী? মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, অতএব উপদেশ দাও; যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। *(আ'লাঃ ৯)*

আরবের এক দাঈ শায়খ ভারতে গেলে ট্রেনে যাকে-তাকে এমনকি চা-ওয়ালাকেও ‘গড ইজ ওয়ান’ বলে তবলীগ করতে লাগলেন, কোন মহিলা আধা বুক বের ক'রে রাখলে তাকে ঢাকতে বললেন। ভারতীয় সঙ্গী তাকে বলল, ‘দাওয়াতের কাজ তো এইভাবে হয় না। সমস্যা দেখা দিতে পারে।’ তিনি বললেন, ‘তোমরা ভারতের লোক খুব ভীতু। প্রকাশ্যে দাওয়াত দিতে হবে। ভয় কীসের? একমাত্র আল্লাহকে ভয় করতে হবে।’

ফেরার পথে নিজের দেশের এয়ারপোর্টে বহু আরবের মহিলা ইউরোপিয়ান ড্রেস পরে ছিল। নিচের দিকে জাং বেরিয়ে ছিল এবং ওপর দিকে অর্ধেক বুক। ভারতীয় সাথী শায়খকে ঐ মহিলাদের দিকে ইঙ্গিত ক'রে বললেন, ‘শায়খ! যান ঐ মহিলাকে নসীহত করুন।’

শায়খ এক নজর তাকিয়ে ‘আস্তাগ্‌ফিরুল্লাহ’ পড়ে মুখ নামিয়ে নিলেন। কারণ তিনি জানতেন, তাকে কিছু বলতে গেলে তার সাথের (ভেড়ুয়া নয়) ভেড়িয়া তাঁকে ছাড়বে না। অবশেষে তিনি স্বীকার করলেন যে, দাওয়াতে

হিকমত ও কৌশল আছে। আবেগ বশে সরাসরি দাওয়াতের ঢিল ছুঁড়ে দিলে হবে না। সুযোগ ও সুফল বুঝলে তবেই দাওয়াতের কৌশল প্রয়োগ ক'রে দাওয়াত দিতে হবে।

অবশ্য মু'মিনদের কথা আলাদা। তাদের হৃদয়ে গ্রহণযোগ্যতার বৈশিষ্ট্য আছে। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে। *(যারিয়াতঃ ৫৫)*

পক্ষান্তরে যাকে পেরে ওঠা দায়, যাকে এড়িয়ে চলা খুব কঠিন, তার অনিষ্টকারিতা থেকে বাঁচতেও কৌশল ব্যবহার করতে হবে।

এক অভদ্র ব্যক্তি আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। নবী ﷺ-এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, “বাজে লোক!” তারপর তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সে যখন বসল, তখন নবী ﷺ তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার সম্পর্কে এই এই (কুমন্তব্য) করলেন। তারপর সে যখন ভিতরে এল, তখন তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন!’ আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক'রে থাকে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

অবশ্য এখান থেকে কেউ চাটুকতা বা খোশামদির দলীল যেন না নেয়। যেহেতু আল্লাহর ব্যাপারে তেল লাগানোর কাজ নেই। তেল লাগানোর কাজের নিন্দা ক'রে আল্লাহ বলেছেন,

( ) ( ) }

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) { ( )

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করো না। তারা চায় যে, তুমি নমনীয় হও। তাহলে তারাও নমনীয় হবে এবং অনুসরণ করো না তার, যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে

একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। যে কল্যাণের কাজে বাধাদান করে, যে সীমালংঘনকারী, পাপিষ্ঠ। রূঢ় স্বভাব এবং তার উপর গোত্রহীন; (এ জন্য যে) সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধিশালী। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে, এটা তো সেকালের উপকথা মাত্র। আমি তার শুঁড় (নাক) দাগিয়ে দেব। *(ক্বালামঃ ৮-১৬)*

অবোধ শিশু আদরের সাথে ওষুধ না খেলে মেরেও খাওয়াতে হবে। কিন্তু সে দায়িত্ব সবার নয়। এ ব্যাপারে আদেশ-নিষেধের পর্যায়ক্রম-রীতি মেনে চলতে হবে।

দাঈর একটি জরুরী নৈতিকতা হিংসা না করা। যেমন সে অহংকারে মানুষের কাছে ছোট হয়ে যায়, তেমনি হিংসার ফলেও সমাজে ছোট হয়ে যায়। ছোট হয়ে বড়দের হিংসা ও গীবত করা আলেম তো দূরের কথা, কোন মুসলিমের কাজ নয়। আর বড় হয়ে ছোটদের হিংসা ও গীবত করা তো আরো নীচতা। এই কদর্যের ফলে সমাজে আলেমদের জন্য একটি উদাহরণ প্রসিদ্ধ আছে ঃ-

এক গ্রামে একজন বাগদাদী আলেম এলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল, নামাযে 'নাওয়াইতু আন....' বলে নিয়ত করা কী?

বাগদাদী সাহেব বললেন, 'নিয়ত করা ফরয। নিয়ত না করলে নামায হবে না।'

গ্রামের এক যুবক বলল, 'কিন্তু কানপুরী সাহেব বলে গেলেন, নামাযে নিয়ত পড়া বিদআত।'

বাগদাদী সাহেব বললেন, 'আরে! ও জানে কী? ও তো একটা গরু!'

গ্রামের লোক চুপচাপ তাঁর খাতির ক'রে বিদায় দিল।

পরের জুমআতে কানপুরী সাহেব এলে ঐ একই বিষয় জিজ্ঞাসার জবাবে 'নিয়ত পড়া বিদআত' বললেন।

গ্রামের উক্ত যুবক বলল, 'কিন্তু বাগদাদী সাহেব তো বলে গেলেন, নিয়ত করা ফরয। তাহলে কোন্‌টা ঠিক?'

কানপুরী সাহেব বললেন, 'আরে! ও জানে কী? ও তো একটা গাধা! ও জানে না যে, নিয়ত করা ফরয, কিন্তু পড়া বিদআত।'

এবারেও গ্রামের লোকে চুপচাপে তাঁকেও বিদায় করল। অতঃপর কিছুদিন পর উভয় আলেম ভাগ্যক্রমে একই দিনে উপস্থিত হলেন। তাঁরা আপোসে সালাম-মুসাফাহাহ ও কোলাকুলি করলেন, কথাবার্তা বললেন, যেন একে অপরের বন্ধু।

তারপর নাশ্‌তার সময় দু'টি প্লেটে সরপোশ ঢাকা নাশ্‌তা আনা হল।

বাগদাদী সাহেব খুশী-খুশী শরপোশ তুলে দেখছেন, প্লেট ভর্তি ঘাস আছে। আর কানপুরী সাহেব শরপোশ তুলে দেখছেন, তাঁর প্লেটে ছানি আছে।

দেখে তো দু'জনেরই চক্ষু চড়ক গাছ! চটে উঠে রোষে ফেটে পড়লেন। রেগে রেগে বলতে লাগলেন, 'একি অপমান! কেন এ অপমান?'

একজন যুবক ভদ্রতার সাথে বলল, 'দেখুন মওলানা! আপনাদের নিজস্ব পরিচয় অনুযায়ী যথোপযোগী খাবার দেওয়া হয়েছে।'

---তা কীভাবে?

---এই তো গত সপ্তাহে উনি আপনার জন্য 'গাধা', আর তার আগের সপ্তাহে আপনি উনার জন্য 'গরু' বলে গেছেন। সুতরাং আপনারা নিজেরা একে অন্যের অপমান করেছেন, আমরা নই।

দু'জনেই বোকা বনে মাথা নিচু ক'রে নিলেন।

বলা বাহুল্য, ঐ গ্রামে তাঁরা উভয়ে আর কোনদিন যেতে পারেননি। তাঁদের দাওয়াতের পথে অন্তরায় হল তাঁদের অন্যায় গীবত।

অনুরূপ একটি বড় অন্তরায় মতভেদ ও বিচ্ছিন্নতা, দলাদলি ও ঠেলাঠেলি। ছোট একটা বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে জামাআত দু'ভাগ। কাঁচের শিশি ভাঙ্গলে আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদের ওপর রাগ করি। আর বুড়োরা যখন জামাআত ভেঙ্গে খানখান ক'রে দেয়, তখন সেটা কি রাগের বিষয় নয়?

গৌণ বিষয় নিয়ে আপোসে ঝগড়া করা, 'আমীন' ও 'রফয়ে য়্যাদাইন' নিয়ে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি এবং মুফতী হয়ে ফতোয়াবাজি করা আহলে সুন্নাহর গুণ নয়।

সুতরাং বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্য বজায় রেখে আক্বীদা সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত দাঈর। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক'রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পর (বিভিন্ন দলে) বিভক্ত হয়েছে ও নিজেদের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি। *(ঐ ঃ ১০৫)*

{ }

অর্থাৎ, সকল বিশ্বাসীরা তো পরস্পর ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা তোমাদের দুই ভাই-এর মধ্যে সন্ধি স্থাপন কর এবং আল্লাহকে ভয় কর;

যাতে তোমরা করুণাপ্রাপ্ত হও। *(হুজুরাতঃ ১০)*

দ্বীনে জোর-জবরদস্তি নেই---এ কথা সবারই জানা। সন্ত্রাসের মাধ্যমে দ্বীন প্রচার হয় না। ভক্তির জায়গায় শক্তি দিয়ে কাউকে মুসলমান বানানো যায় না। অভিজ্ঞতার কথা যে, মুসলিমদের সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়। ইতিহাসে এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ মেলে।

আশাবাদিতা

দাঈর মনে দাওয়াতের দৃঢ় সংকল্প থাকবে, হিম্মত ও আশাবাদিতা থাকবে, ইতিবাচক ধারণা থাকবে। তবেই দাওয়াত সাফল্যের শিখরে উত্তীর্ণ হতে পারবে।

আশাবাদী মানুষ চারিদিক অন্ধকারের মাঝে আলো দেখতে পায়। পক্ষান্তরে যে আশাবাদী নয়, সে চারিদিক আলোর মাঝেও অন্ধকার দেখে। নিরাশ মনে কর্মে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। মরার আগে মরতে বসে। সক্রিয় ভূমিকায় থেকেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

তবে আশাবাদিতার মানে এই নয় যে, বাস্তবকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করতে হবে; বরং আশাবাদিতা হল হতাশার অন্ধকার অগ্রাহ্য ক'রে আশার আলো জ্বালিয়ে দাঈ কাজের পথে অগ্রসর হবে।

মুসলিম বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখলে হতাশা আসে, মুসলিমদের দুরবস্থা দেখলে মন নিরাশ হয়, মুসলিমদের শত্রু-আধিক্য দেখলে মনের ভিতরে আশার প্রদীপ নিভে যায়। কিন্তু না, তবুও বিজয়ের আশা রেখে পথ চলতে হবে। কারণ, নিরাশ হওয়া মু'মিনদের বৈশিষ্ট্য নয়। মহান আল্লাহ ইব্রাহীম ﷺ-এর কথা উদ্ধৃত ক'রে বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, সে বলল, 'পথভ্রষ্টরা ব্যতীত আর কে নিজ প্রতিপালকের অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়?' *(হিজ্‌রঃ ৫৬)*

কাফেরদের বিজয় দেখে বিষণ্ন হওয়া উচিত নয়, মুনাফিকদের প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে মনঃক্ষুণ্ন হওয়া উচিত নয়, ফাসেক-ফাজেরদের পার্থিব শান-শওকত দেখে মন খারাপ করা উচিত নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। *(আলে ইমরানঃ ১৩৯)*

দাঈর জানা উচিত যে, নিরাশাবাদী অশুভ ধারণা নিষেধ এবং আশাবাদী

শুভ ধারণা বৈধ।

নবী ﷺ বলেছেন, "রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়। আর তা হল, উত্তম বাক্য।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কিন্তু তা কেন?

তা এই জন্য যে, অশুভ ধারণার কোন প্রকৃততত্ত্ব নেই। আর তাতে মানুষ ভাল কাজে পিছপা ও অনগ্রসর থাকে। পক্ষান্তরে শুভ ধারণার প্রকৃততত্ত্ব থাক বা নাই থাক, মানুষ তার ফলে সৎকর্মে উদ্বুদ্ধ হয়, আশাবাদী হয়ে মনে উদ্দীপনা পায়।

কোন মানুষের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে এ কথা ভাবা ঠিক নয় যে, সে আর পথ পাবে না। বরং আশা রেখে তাকে দাওয়াত দিতে হয়।

জাঁদরেল উমার বিন খাত্তাবের ব্যাপারে অনেকের ধারণা ছিল, তিনি ইসলাম গ্রহণ করবেন না। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ ক'রে সকলের ধারণা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

ক্বারামিত্বাগণ হজ্জের মৌসমে মক্কার হারামে প্রবেশ ক'রে শত শত মুসলিম হত্যা করেছিল! কা'বাগৃহের কোণ থেকে হাজারে আসওয়াদ তুলে নিয়েছিল। তারা গর্ব ও ব্যঙ্গ ক'রে বলেছিল, 'কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী? কোথায় কাঁকর-বৃষ্টি?'

সে পাথর বাহরাইনে নিয়ে গিয়ে ষোল বছরেরও বেশি সময় আটকে রেখেছিল। তখন অনেকেই ধারণা করেছিল যে, আর পাথর কা'বায় ফিরবে না। কিন্তু সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

খ্রিষ্টানগণ বায়তুল মাক্বদিস দখল ক'রে শতাধিক বছর ধরে ফিলিস্তীনে রাজত্ব করল। তখন অনেকে ধারণা করেছিল যে, মুসলিমদের পূর্ব-ক্বিবলা হয়তো আর তাদের দখলে ফিরে আসবে না। কিন্তু সালাহুদ্দীন আইয়ুবী এসে বায়তুল মাক্বদিস স্বাধীন ক'রে সে অশুভ ধারণা ভুল প্রমাণিত করলেন।

আজও অনেকে ধারণা করে, বায়তুল মাক্বদিস ইয়াহুদীরা দখল ক'রে আছে। সারা পৃথিবীতেও তাদের আধিপত্য চলছে। বায়তুল মাক্বদিস হয়তো আর মুসলিমদের হাতে ফিরে আসবে না। কিন্তু সে ধারণাও একদিন বেঠিক প্রমাণিত হবে---ইন শাআল্লাহ।

কে জানে যে, মদ-মাতালের ঘরে জন্ম নেওয়া কোন ছেলে মানুষ হবে না?

কে জানে যে, সারকুঁড়ে কোন পদ্মফুল ফুটবে না?

কে বলে যে, বেনামাযী ঘরে তাহাজ্জুদ-গুযার তৈরি হবে না?

কে মানে যে, অমুক কাফের মুসলিম হবে না।

হিদায়াতের মালিক তো সে নয়। তাহলে তার এ কুধারণা কেন?

না, অসম্ভব আশা ও ধারণা করতে বলছি না। নিম গাছ থেকে আঙ্গুর ফলের আশা করতে বলছি না। যেহেতু নিম গাছের কোন পরিবর্তন নেই। পক্ষান্তরে মানুষের হৃদয়ের আজব পরিবর্তন আছে। “আদম-সন্তানের সমস্ত হৃদয় পরম দয়াময়ের আঙ্গুলসমূহের মধ্যে দু’টি আঙ্গুলের মাঝে একটি হৃদয়ের মত আছে। তিনি তা ইচ্ছামত আবর্তন ক’রে থাকেন।” *(মুসলিম ৪/২০৪৫)*

হিকমত অবলম্বন

‘হিকমত’ শব্দের অর্থ কৌশল বা প্রজ্ঞা।

হিকমত হল ইলমের মাখন।

হিকমত অবলম্বন করা মানে ঃ প্রত্যেক জিনিসকে তার যথোপযুক্ত জায়গায় রাখা।

হিকমত অবলম্বন করার অর্থ হল ঃ প্রত্যেক কাজের সঠিকতার নাগাল পাওয়া।

হিকমত অবলম্বন করার মানে হল ঃ কথা ও কাজে সঠিকতা ও আদব বজায় রাখা।

কেউ যদি নিজের সাত বছরের ছেলেকে নামাযের জন্য মারে, তাহলে সে ‘হাকীম’ (প্রজ্ঞাবান) নয়। কারণ নামায না পড়লে তাকে দশ বছর বয়সে মারার হুকুম আছে। নিশ্চয় সে চাষী ‘হাকীম’ নয়, যে ফসল পাকার আগেই কেটে ফেলে। সে ডাক্তার ‘হাকীম’ নয়, যে রোগ নির্ণয় না করেই চিকিৎসা করে।

হিকমত মানে ঃ সুন্নাহ। হিকমত অবলম্বন করার মানে হল কথা ও কাজে সুন্নাহ অবলম্বন করা।

হিকমত অবলম্বন করার মানে হল ঃ

প্রত্যেক হকদারকে তার হক প্রদান করা।

কোন বিষয়ে সীমা লংঘন না করা।

প্রত্যেক মানুষকে তার যথা মর্যাদা প্রদান করা।

সময় হওয়ার পূর্বে কোন জিনিস পেতে তাড়াহুড়া না করা।

কোন কাজের ফললাভে শীঘ্রতা না করা।

কোন কাজকে যথাসময় হতে পিছিয়ে না দেওয়া।

দাওয়াতের কাজে হিকমত অবলম্বন করতে হবে দাঈকে। যেহেতু

হিকমত বা প্রজ্ঞা বড় সম্পদ। জ্ঞানের সাথে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি যুক্ত হলে প্রজ্ঞাবান হওয়া যায়। সত্যপক্ষে, যার হিকমত আছে, সে অনেক কল্যাণের অধিকারী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন, আর যাকে প্রজ্ঞা প্রদান করা হয়, তাকে নিশ্চয় প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। বস্তুতঃ শুধু জ্ঞানীরাই উপদেশ গ্রহণ ক’রে থাকে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৬৯)*

প্রজ্ঞা হচ্ছে সঠিক সময়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা।

একজন বলল, ‘মাছ নেবেন, না জাল নেবেন?’ নিলে কোন দাম লাগবে না, বিনা পয়সায় পাবেন। তবে দু’টির মধ্যে একটি পাবেন, হয় ২টি মাছ, না হয় মাছ ধরা জাল।

আপনি প্রজ্ঞাবান বা হাকীম হলে নিশ্চয় জালটাই এখতিয়ার করবেন। কারণ, মাছ এক বা দু’দিনে রান্না ক’রে খেয়ে শেষ ক’রে দেবেন। আর জাল থাকলে (বৈধ পানিতে) বারবার মাছ ধরে খেতে পারবেন।

একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘চিনি হওয়া ভাল, না খাওয়া ভাল?’ আপনি হাকীম হলে নিশ্চয় পরোপকারিতার কথা মাথায় রেখে বলবেন, ‘চিনি হওয়া ভাল।’ আর স্বার্থপর হলে বলবেন, ‘চিনি খাওয়া ভাল।’

এক রাজা স্বপ্নে দেখল, তার বাগানের সব গাছগুলি ঝড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তার বৃত্তান্ত বললেন, ‘আপনার চোখের সামনে আপনার সকল আত্মীয়-স্বজন মারা যাবে।’ এ কথা শুনে রাজা রেগে গেল এবং তাকে কারাবন্দী করার হুকুম দিল।

অপর একজন আলেমকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, ‘আত্মীয়দের মধ্যে জাহাঁপনার বয়স সবার চেয়ে দীর্ঘ হবে।’ এ খবর শুনে রাজা তাঁকে পুরস্কৃত করল।

একই কথা খাড়াখাড়িভাবে বললে তিরস্কার এবং একটু হিকমতের সাথে বললে পুরস্কার পাওয়া যায়।

দাওয়াতের কাজে আমাদের পথিকৃৎ ও আদর্শ হলেন মহানবী ﷺ। সব কাজেই তিনি আমাদের নমুনা। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং

আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাব ঃ ২১)*

পরবর্তী কোন নেতা বা বুযুর্গ আমাদের আদর্শ নয়। অতএব আমাদের দাওয়াত রাজনীতি বা ফাযায়েল দিয়ে শুরু নয়। বরং তওহীদ দিয়ে।

যেখানে তওহীদ নেই, সেখানে আমরা নেই। যারা সঠিক অর্থে তওহীদবাদী নয়, তাদের সাথে আমাদের আপোস নেই, তাদের সাথে আমাদের সম্পর্ক নেই। এ ব্যাপারে আমাদের আদর্শ তাওহীদের ইমাম আবুল আম্বিয়া ইব্রাহীম ﷺ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ।' *(মুমতাহিনা ঃ ৪)*

পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত অধিক জরুরী বিষয় দিয়ে দাওয়াত শুরু করা। আগে সংশোধন, তারপর বীজবপন। আমাদের নীতি ঃ প্রথমে সংশোধন, তারপর সংগঠন। সর্বপ্রথম মানুষের আক্বীদা সংশোধন, তারপর তার আমল-আখলাক সংশোধন, তারপর সংগঠনের কথা। সংশোধনের মাধ্যমে ইসলামী পরিবেশ তৈরি হবে, তবে আসবে ইসলামী শাসন। পরিবেশ তৈরির আগে কি ইসলামী শাসন চলবে?

পরিবেশ বড় দুষ্ট হয়ে আছে। সর্বাগ্রে দূষণমুক্ত করার কাজ করতে হবে। সংশোধন করতে হবে বর্তমান জামাআতে ঐক্য বজায় রেখে। জং না ছাড়তে চাইলে লোহার ওপর হাতুড়ির বাড়ি চলে, কিন্তু কাঁচের ওপর তো চলবে না। যেখানে স্বর্ণকারের ঘা লাগবে, সেখানে কর্মকারের ঘা দিলে তো বানাবার জায়গায় ভেঙ্গেই যাবে।

আমাদের দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হল, তওহীদ প্রতিষ্ঠা, ঐক্য প্রতিষ্ঠা, অতিরঞ্জন ও ঢিলেমির মধ্যবর্তীপন্থা।

আমাদের দাওয়াতে থাকবে হিকমত, নবুঅতের আলো, কৌশল ও যৌক্তিকতা। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত। *(নাহল ঃ ১২৫)*

সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দানের কাজ বিরাট মহান কাজ। এ কাজ সর্বদা সাদা-সিধা ও সরলভাবে করা হলে ফলপ্রসূ হয় না। যদিও তাতে পুরো স্বার্থ থাকে সেই ব্যক্তির যাকে আদেশ ও নিষেধ করা হয়, তবুও সে দাঈকেই স্বার্থপর ভাবে। উপদেষ্টাকে শত্রু মনে করে!

ট্রাফিক আইনে শিগন্যাল অমান্য ক'রে গেলে, গাড়িতে বসে সিট-বেল্ট্ না বাঁধলে, নির্ধারিত স্পিডের বেশি গাড়ি চালালে জরিমানা হয়। এ জরিমানা হয় গাড়ি-ওয়ালার স্বার্থেই। কিন্তু জরিমানা দিতে হলে গাড়ি-ওয়ালা কর্তৃপক্ষকে যালেম মনে করে।

যেমন শিশুরা ডাক্তারকে কষ্টদাতা যালেম মনে করে।

আসলেই দ্বীনের দাঈ একজন ডাক্তারের মত। তাঁকে নিজ চিকিৎসায় বড় কৌশল ও হিকমত অবলম্বন করতে হয়। যাকে যেভাবে ওষুধ খাওয়ালে উপকারী হবে বলে মনে করেন, তাকে সেইভাবে উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে থাকেন।

জ্ঞানী চিকিৎসক সেই ডাক্তার, যিনি দুটো রোগের মধ্যে যেটা বেশী মারাত্মক সেটার চিকিৎসা আগে করেন। একটি লোকের সর্দি, পায়খানা হওয়ার পর যদি তাকে সাপে কাটে, তাহলে তিনি সাপে কাটার চিকিৎসাই আগে করেন।

একটি লোক পানিতে ডোবা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য যদি আপনার দিকে হাত বাড়ায় এবং তার হাতে সোনার আংটি থাকে, তাহলে সোনার আংটি ব্যবহার বর্জন করতে উপদেশ দিয়ে সময় নষ্ট না করে, তাকে আগে হাত ধরে টেনে তুলে উদ্ধার করুন।

একজন বাম হাতে গ্লাস ধরে মদ খাচ্ছিল। এক দাঈ তাকে বললেন, 'আল্লাহর বান্দা! আল্লাহকে ভয় কর, ডান হাতে খাও।'

বুঝতেই পারছেন, এ আদেশে কোন হিকমত নেই। যার চিকিৎসা আগে করা দরকার, তার চিকিৎসা করা হয়নি।

একজন চাষী যখন জমিতে কোন ফসল লাগায়, তখন সে আগাছা ও ঘাসের উপরেই বীজ ছড়ায় না। বরং সে প্রথমতঃ জমিকে চাষ দিয়ে আগাছা

ও ঘাসমুক্ত ক’রে নেয়, তারপর বীজ ছড়ায়। মানুষের মনও এক প্রকার জমির মতই। তাতেও কিছু বপন করার আগে ঐ চাষীর মতই যথারীতি প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, কোন মানুষের আমূল সংস্কার না হলে, তার ইবাদত ও সুন্দর ব্যবহার কোন কাজের হয় না। যে মানুষের মনের ভূমি শির্ক ও বিদআতের জঞ্জালে পরিপূর্ণ, সে ভূমিতে নামায-রোযা ও দরূদ শরীফের ফাযায়েলের বীজ রোপণ করলে কি উপকারী হবে বলে মনে করেন?

সমাজ সংস্কারের কাজে আমূল পরিবর্তন বড় ফলপ্রসূ। মহানবী ﷺ-এর আমল আমাদের মহান আদর্শ। তিনি মক্কাতে রাজা হতে চাননি। তিনি প্রথমে যা চেয়েছিলেন, তা হল মানুষের মন থেকে শির্কের জঞ্জাল তুলে ফেলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র বীজ বুনতে। সর্বপ্রথম আক্বীদার চাষ দিয়ে মনের জমি পরিষ্কার ক’রে তারপর আমলের বীজ রোপণ করেছিলেন।

আল্লাহর রসূল ﷺ যখন মুআয বিন জাবালকে ইয়ামান প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, “তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের দিকে অগ্রসর হচ্ছ, যারা আহলে কিতাব। সুতরাং তোমার প্রথম দাওয়াত (আহবান) হবে তওহীদের দিকে। (আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রসূল -এই কথার সাক্ষ্য দেওয়ার প্রতি।) অতঃপর এ কথা যদি (যখন) তারা জেনে ও মেনে নেয়, তাহলে (তখন) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ দিবারাত্রে তাদের উপর ৫ অক্ত নামায ফরয করেছেন। অতঃপর তারা এ কথা মেনে নিলে (৫ অক্ত নামায পড়তে শুরু করলে) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের মালের উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদের মাঝে বন্টন করা হবে। অতঃপর তারা তা মেনে নিলে (যাকাতে) তাদের সর্বোত্তম মাল গ্রহণ করা থেকে দূরে থেকো। আর মযলুম মানুষের দুআ থেকে সাবধান থেকো। কারণ, সেই দুআ ও আল্লাহর মাঝে কোন অন্তরাল থাকে না।” *(বুখারী, মুসলিম)*

কিয়ামতে সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের। কিন্তু যার আক্বীদাই শুদ্ধ নয়, তার নামাযেরও হিসাব নেওয়া হবে না।

তিনি সুন্দর আখলাক ও ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের মনের সংস্কার সাধন করেছিলেন।

তিনি ধীরে-ধীরে ধাপে-ধাপে মানব-মনের আমূল সংস্কার এনেছিলেন। তার জন্যই শরীয়তে নাসেখ-মানসূখের ব্যাপারটা শিরোধার্য।

মদ নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা দেখুন, এক বাক্যে মদকে হারাম ঘোষণা

করা হয়নি। তাতে হিকমত ও ধাপ ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে বলা হল, “মদের উপকারিতার চাইতে অপকারিতাই বেশী।” *(বাক্বারাহ ঃ ২১৯)*

তারপর বলা হল, “তোমরা মদ খেয়ে নামাযে এসো না।” *(নিসা ঃ ৪৩)*

অবশেষে বলা হল, “মদ অপবিত্র ও তা পান করা শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর।” *(মাইদাহ ঃ ৯০)*

এতেও দ্বীনের দাঈর জন্য শিক্ষা রয়েছে। সুতরাং সংশোধনের জন্য তাড়াহুড়া ক’রে আবেগে আপ্লুত হয়ে ‘খুন হয়ে যাব’ বলা ঠিক নয়, বরং কাজ চালিয়ে যেতে হবে ধীরে-ধীরে।

একদা উমার বিন আব্দুল আযীয খলীফার ছেলে আব্দুল মালেক আব্বাকে বললেন, ‘আপনি হক প্রতিষ্ঠা করতে দেরী করছেন কেন? (সত্বর) হক প্রতিষ্ঠা করুন। তাতে গরম হাঁড়িতে ফুটতে হয়, তাও স্বীকার। কারণ তা হবে আল্লাহর পথে!’

আব্বা আবেগাপ্লুত ছেলেকে বললেন, ‘তাড়াহুড়া করো না বেটা! মহান আল্লাহ দু’টি আয়াতে প্রথমে মদের কেবল নিন্দাবাদ ক’রে তারপরে তৃতীয় আয়াতে হারাম ঘোষণা করেছেন। আমি ভয় করি যে, যদি সকল হক মানুষের ঘাড়ে এক সঙ্গে চাপিয়ে দিই, তাহলে হয়তো এক সঙ্গে তারা সব রদ ক’রে দেবে এবং ফিতনা সৃষ্টি হবে।’ *(আল-মুওয়াফাক্বাত, শাত্বেবী ২/৯৪)*

এ হল মদ হারামের কথা। কিন্তু শির্ক বর্জন করার কথা মহান আল্লাহর সর্বপ্রথম আদেশ।

আল-কুরআনের প্রথম আদেশ, ‘হে মানুষ তোমরা (কেবল) আল্লাহর ইবাদত কর।’ *(বাক্বারাহ ঃ ২১)*

আল-কুরআনের সর্বপ্রথম নিষেধ, ‘তোমরা আল্লাহর সাথে কোন শরীক করো না।’ *(ঐ ঃ ২২)*

তারই জন্য তিনি নবী-রসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও তাগূত থেকে দূরে থাক। *(নাহল ঃ ৩৬)*

{ }

অর্থাৎ,এরপর তাদেরই একজনকে তাদের নিকট রসূল ক’রে পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল, ‘তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তবুও কি তোমরা সাবধান হবে না?’ *(মু’মিনূন ঃ ৩২)*

একটি বালতিতে সমপরিমাণের পাথর, বালি ও পানি রাখতে হলে, আগে পাথর তারপর বালি এবং সবশেষে পানি রাখলে ৩টিই রাখা সম্ভব, নচেৎ আগে পানি ও বালি রেখে তারপর পাথর রাখতে গেলে তার জায়গা আর হবে না। জ্ঞানী দাঈ দাওয়াতের ক্ষেত্রেও সেই খেয়াল রাখে, যে বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার, সে বিষয়টিকে আগে বেছে নেয়।

যে ব্যক্তি দু'টি পাখিকে এক সঙ্গে শিকার করতে চায়, সে দু'টিকেই হারিয়ে বসে। দ্বীনের দাঈকে এমন করা উচিত নয়।

জ্ঞানীর কাজ দরজা দিয়েই বাড়ি প্রবেশ করা। সে যথানিয়মে কর্ম ক'রে তার নির্দিষ্ট ফল লাভ করার চেষ্টা করে। কার মনে কীভাবে প্রবেশ করতে হবে---তা জানা ও তার জন্য কৌশল অবলম্বন করা দাঈর কর্তব্য।

একদা এক যুবক আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'আপনি আমাকে ব্যভিচার করার অনুমতি দিন!' তিনি বললেন, "তুমি কি তোমার মায়ের সাথে তা পছন্দ কর? তোমার বোন বা মেয়ের সাথে, তোমার ফুফু বা খালার সাথে তা পছন্দ কর?" যুবকটি প্রত্যেকের জন্য উত্তরে একই কথা বলল, 'না। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার জন্য আমার জীবন কুরবান হোক। (তাদের সঙ্গে আমি এ কাজ করতে চাই না।)' তখন মহানবী ﷺ বললেন, "তাহলে লোকেরাও তো পছন্দ করে না যে, কেউ তাদের মা, মেয়ে, বোন, খালা বা ফুফুর সাথে ব্যভিচার করুক।" অতঃপর নবী ﷺ তার জন্য দুআ করলেন এবং সে ভাল লোক হয়ে গেল। *(আহমাদ ৫/২৫৬-২৫৭, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৭০ নং)*

কাজ ভাল হলে বলা হয়, 'মাথা ধরলে মাথার ব্যথা কীভাবে সারবে, সে ব্যবস্থা করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। মাথাটাকে কেটে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।' যেহেতু 'নাই-মামা থেকে কানা মামাই ভাল।'

কিন্তু খারাপ হলে বলা হয়, 'না রহে বাঁশ, না বাজে বাঁশরী।' 'কানা গরু থেকে শূন্য গোয়ালই ভাল।'

দ্বীনের দাঈর উচিত, উক্ত হিকমত অবলম্বন করা। যেহেতু অসূলী কায়দায় বলা হয়, 'কল্যাণ আনয়ন অপেক্ষা অকল্যাণ দূরীকরণই প্রাধান্যযোগ্য।'

এক জায়গায় গান-বাজনা হচ্ছে। সেখানে মিষ্টি কথায় চিঁড়ে ভিজল না। সুতরাং বোমা ফাটিয়ে সব তছনছ ক'রে তা বন্ধ করা হল। দু-একটা প্রাণও গেল বৈকি? অবশ্যই সেটা হাকীমের কাজ হল না। কারণ, অকল্যাণ বন্ধ করতে গিয়ে আরো বড় অকল্যাণ ঘটে গেছে। যা শরীয়তে বাঞ্ছনীয় নয়।

ফিতনার ভয়ে হক গোপন করা হিকমতের পর্যায়ভুক্ত। হক কথা হলেই

সব সময় সব জায়গায় বলা যায় না।

নামাযের সময় কথা বলা যায় না। মন্দ কাজে বাধা দেওয়া অথবা কথা বলতে নিষেধ করাও নামাযের পরিপন্থী কর্ম এবং তাতে নামায বাতিল হয়ে যায়। ঈদের নামায পড়তে গেছে তিন বন্ধু। নতুন নতুন প্যান্ট-শার্ট্ পড়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নামায পড়ছে। সিজদায় গিয়ে প্রথম বন্ধুর প্যান্টের এক জায়গায় 'কট্' ক'রে সুতো কেটে গেল। চট্ ক'রে সে বলে উঠল, 'অগামার্কা দর্জিকে বললাম, প্যান্টটা যেন টাইট না হয়। এখন কত অসুবিধা!'

দ্বিতীয় বন্ধু বলে উঠল, 'আরে! নামায পড়তে পড়তে কথা বলতে হয় না।'

তখন আপত্তি ক'রে তৃতীয় বন্ধুও বলল, 'আরে! তুইও তো বললি!'

আসলে ভাল কথা বলতে গিয়েও কি দ্বিতীয় ও তৃতীয় বন্ধুর নামায নষ্ট হল না? অবশ্যই।

এক রুমে দেখলেন, অবিবাহিত এক জোড়া যুবক-যুবতী আপত্তিকর অবস্থায় শুয়ে আছে। স্বচক্ষে দেখলেন, তারা ব্যভিচার করছে। কিন্তু এ কথা আপনি বলতে পারবেন না। কাযীর কাছেও না। কারণ, তারা অস্বীকার করলে আরও তিনজন সাক্ষী ছাড়া আপনি একা মিথ্যা অপবাদের শাস্তি আশি চাবুক খেতে পারেন।

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, 'আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট থেকে দু'টি (জ্ঞান) পাত্র সংরক্ষণ করেছি। যার একটি তো আমি প্রচার করে দিয়েছি। কিন্তু ওর দ্বিতীয়টি যদি প্রচার করতাম, তাহলে আমার এই কণ্ঠনালী কাটা যেত। *(বুখারী ১২০নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে বলেছিলেন, "তোমার কওম যদি কুফরীর নিকটবর্তী যুগের (নও-মুসলিম) না হত, তাহলে অবশ্যই আমি কা'বা ঘরকে ভেঙ্গে ইব্রাহীম عليه السلام-এর ভিত্তি অনুসারে পুনর্নির্মাণ করতাম এবং তার জন্য দু'টি দরজা বানাতাম।" *(বুখারী ১২৬, মুসলিম ১৩৩৩নং, আহমাদ, নাসাঈ)*

হিকমত অবলম্বন মানে অন্যায় দেখে চুপ থাকা নয়। ফিতনার ভয়ে চুপ থাকা ভাল। কিন্তু শির্ক দেখে চুপ থাকা কোন হিকমত নয়। আক্বীদায় চুপ থেকে আমলে জোর দেওয়া হিকমত নয়। বুনিয়াদ ছাড়া কি অট্টালিকা হয়? নাক না থাকলে কি নথ পরানো হয়? পাছায় কাপড় না থাকলে কি টুপির বাহার বৃদ্ধি করা বোকামি নয়?

'হারূন عليه السلام ফিতনার ভয়ে শির্কে বাধা দেননি'---এ কথাটি ঠিক নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( )

( ) ( )

( )

( ) {

অর্থাৎ, হারূন ওদেরকে পূর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তোমাদের কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক পরম দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।' ওরা বলেছিল, 'আমাদের নিকট মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না।' মূসা বলল, 'হে হারূন! তুমি যখন দেখলে ওরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল আমার অনুসরণ করা হতে? তবে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে?' হারূন বলল, 'হে আমার সহোদর! আপনি আমার দাড়ি ও মাথা (চুল) ধরবেন না। আসলে আমি আশঙ্কা করলাম যে, আপনি বলবেন, তুমি বানী ইস্রাঈলদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার কথার অপেক্ষা করনি।' *(ত্বাহাঃ ৯০-৯৪)*

অন্যত্র বলেছেন,

( )

অর্থাৎ, আর মূসা যখন ক্রুদ্ধ ও দুঃখিত অবস্থায় স্বীয় সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করল, তখন বলল, 'আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা কিই না জঘন্য কাজ করেছ! তোমাদের প্রতিপালকের আদেশের পূর্বেই কেন তোমরা তাড়াহুড়া করতে গেলে?' সে ফলকগুলি ফেলে দিল এবং তার ভাইকে মাথায় ধরে নিজের দিকে টেনে আনল। হারূন বলল, 'হে আমার মায়ের পুত্র (সহোদর)! লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়েছিল। সুতরাং আপনি আমাকে নিয়ে শত্রু হাসাবেন না এবং আমাকে অনাচারীদের দলভুক্ত গণ্য করবেন না।' *(আ'রাফঃ ১৫০)*

আয়াতগুলো ভালভাবে পড়লে লক্ষ্য করা যাবে যে, হারূন ﷺ ফিতনার

ভয়ে শির্কে বাধা না দিয়ে চুপ থাকেননি। বরং তিনি বাধা দিলেন। কিন্তু লোকে তাঁকে ছোট ভাবল এবং খুন করতে উদ্যত হল! সুতরাং তিনি বড় ভাইয়ের আসার অপেক্ষা করলেন।

বলা বাহুল্য, উক্ত ঘটনায় শির্কের প্রতিবাদ না ক'রে চুপ থেকে একতার লক্ষ্যে কেবল সর্ববাদিসম্মত ফাযায়েল ও মাসায়েল বলে সাংগঠনিক ফায়দা লুটার দলীল নেই।

অন্যায়ের সাথে সাময়িক সন্ধি হতে পারে, কিন্তু অন্যায়ের সাথে আপোস হতে পারে না।

খোশামোদ, তোষামোদ, মুসাহেবী ইত্যাদি কোন হিকমত নয়। অবশ্য কারো মেজাজের সঙ্গে প্রয়োজনে তাল মিলিয়ে চলে দাওয়াত পেশ করা হিকমতের পর্যায়ভুক্ত।

জানালা দিয়ে হাওয়া ঢুকে উড়ে যাওয়া কাগজগুলি তোলার আগে জানালাটা বন্ধ করতে হয়। অগ্নিশিখা গগন-চুম্বি হলে অগ্নিদমনকর্মীরা শিখার উপরে পানি ছড়ায় না। বরং অগ্নির উৎসস্থলে পানি ছড়ায়। মশা থেকে বাঁচার জন্য মশারি দান ক'রে বেড়ানোর চাইতে, পারলে মশার কারখানা বন্ধ করুন। দুর্গন্ধময় পরিবেশে আতর ছড়িয়ে বেড়ানোর চাইতে, ক্ষমতা থাকলে আগে দুর্গন্ধের উৎসমুখ বন্ধ করুন।

এখান হতে হিকমত নিন এবং হিকমত নিন কবির নিম্নের উক্তি থেকে ঃ-

'ধর্ম কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙ্গে মন্ত্র ঝাড়ে যে বেকুব।
ব্যাঘ্র সাহেব হিংসা ছাড়, পড়বে এসে---বেদান্ত,
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ অমনি হবে কৃতান্ত।
থাকতে বাঘের দন্ত নখ,
বিফল ভাই ঐ প্রেম-সবক।'

ধৈর্যশীলতা

দাওয়াতের কাজ অনেকের নিকট আণ্ডা খাওয়ার কাজ হলেও, আসলে তাতে ডাণ্ডাও খেতে হয়।

এ কাজ করলে তথাকথিত আলোকপ্রাপ্তদের কাছে ছোট হতে হয়।

বহু লোকের কাছে নাক-সিঁটকানি শুনতে হয়।

বহু লোকের কাছে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ নীরবে সহ্য করতে হয়।

বহু লোকের কাছে বিনা প্রতিবাদে হেনস্থার অপমান সইতে হয়।

বহু লোকের কাছে 'চোখের বালি' হতে হয়।

বহু লোকের কাছে কুমন্তব্য ও অপবাদ শুনতে হয়।

বহু লোকের কাছে হিংসার জ্বালাময় তীরের আঘাত হাসিমুখে বরণ ক'রে নিতে হয়।

বিরোধীদের নিকট হতে 'পাগল, ভ্রষ্ট' ইত্যাদি খেতাব শুনতে হয়।

হিংসার একশেষের উদাহরণ স্বরূপ আমার নিজের অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স্ পেলাম। এক হুজুরকে কেউ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি চান্স্ পাননি?' জবাবে হুজুর বললেন, 'ও লটারীর ব্যাপার। লটারীতে যার নাম আসে, সেই চলে যায়!'

অথচ লটারীতে নাম আসার জন্য যে নম্বর লাগে, তা তাঁর ছিল না। তবুও নিজের অহংকার ও হিংসা বজায় রেখে বড় সাজলেন।

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাদীস প্রতিযোগিতায় এক হুজুরের ১০০/১০০ নম্বর ছিল। আমারও তাই ছিল। কিন্তু সিরিয়ালে আমার নামটা তাঁর নামের উপরে ছিল। তাই অহংকার ও হিংসায় ক্ষোভ প্রকাশ ক'রে বললেন, 'আরে ওর নামটা আগে দিল কেন?' অর্থাৎ, তিনি মনে করেন, তিনি আমার থেকে বড়। সুতরাং তাঁর নামটা উপরে থাকা দরকার ছিল। কিন্তু যিনি লিখেছেন, তিনি তো কারো জ্বলা চোখের খবর জানতেন না।

অনুরূপ জালসার প্রচার-পত্রে নাম লিখাতেও ঘটে থাকে।

বিশটা বছর ধরে বিদেশ ক'রে বাড়ি করলাম। আমার অনুপস্থিতিতে বাড়িটা বড় হয়ে গেল। তাতে অনেকের ক্ষোভ। হিংসায় আমার বই পড়তেও রাজি নয় অনেকে। অনেকে পড়ে ছিদ্রান্বেষণের জন্য!

অনেক বই লিখেছি। অনেকে বলে, 'গাড়ি-গাড়ি বই লিখেছে।' সুতরাং 'বহুগ্রন্থ-প্রণেতা' প্রশংসা শুনতেই তাঁদের গায়ে বিছুটির পাতা লাগে। আর তারই জ্বালায় চট্ ক'রে বলে বসে, 'কিন্তু ভাষা ততটা উন্নত নয়।'

কেউ আবার অন্য দোষ না পেয়ে 'গাঁইয়া' বলেন! যেহেতু গ্রামে আমার বাড়ি। যদিও আমি সেই অহংকারী শহুরে থেকে অনেক অনেক উন্নত শহুরে পরিবেশ ও আসবাব-পত্র-সজ্জিত বাড়িতে বাস করি।

কেউ আবার 'মাদানী' লিখতে দেখে হিংসায় জ্বলে উঠে মিল দিয়ে 'পাদানি' শব্দ ব্যবহার করেন! তখন আমার মাথা হয় তাঁদের অহংকার-ঘোড়ার হিংসা জিন-পোশের পা-রাখার পাদানি।

অনেকে হিংসার জ্বালায় আমার আত্মীয়-স্বজনের ত্রুটি উল্লেখ ক'রে আমাকে 'ছোট' করতে চান।

আসলে হিংস্র কেলে যেভাবেই পারে, সেভাবেই ছোবল মারে। আর সেই

দংশন-জ্বালা সহ্য করতে হয় দাঈকে। হিংসায় মানুষ অন্ধ হয়। আর অন্ধের ধাক্কা তো সয়ে নিতেই হয়। হিংসার মদিরায় মানুষ মাতাল হয়। আর মাতালের প্রলাপ তো উপেক্ষা করতেই হয়।

নানা অপবাদের সম্মুখীন হয়েও ফিতনার ভয়ে অথবা বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে চুপ থাকতে হয়, ধৈর্য ধরতে হয়। মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ কে বলেছিলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্যধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে তাদেরকে পরিহার ক'রে চল। *(মুযযাম্মিলঃ ১০)*

{ }

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর এবং আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাদাতা। *(ইউনুসঃ ১০৯)*

অর্থাৎ, হে নবী! আল্লাহ তাআলা যা প্রত্যাদেশ করেন, তা শক্তভাবে ধর। যা আদেশ করেন, তা পালন কর। যে জিনিস থেকে নিষেধ করেন, সে জিনিস থেকে বিরত থাক এবং কোন বিষয়ে শৈথিল্য করো না। আর অহী অনুযায়ী চলতে যে কষ্ট হবে, বিরোধীদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট আসবে এবং দাওয়াত ও তবলীগের পথে যে সমস্যার সম্মুখীন হবে, সব কিছুর উপর ধৈর্য ধারণ কর এবং শক্তভাবে সব কিছুর মোকাবিলা কর।

'তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাদাতা।' যেহেতু তাঁর জ্ঞান পরিপূর্ণ, তাঁর ক্ষমতা ও শক্তি অপরিসীম এবং তাঁর করুণাও সর্বব্যাপী। ফলে তাঁর থেকে উত্তম বিচারক ও ফায়সালাদাতা আর কে হতে পারে? হয়তো বা এমন ফায়সালা আসতে পারে, যাতে তোমার বিরোধীরা হিদায়াত পাবে এবং তোমার ভক্ত অনুগামীতে পরিণত হবে। অথবা তাঁর পক্ষ থেকে এমন আযাব আসবে, যার পেষণ তাদেরকে শায়েস্তা করে ছাড়বে।

আলেম-যালেম অনেকেই দাঈর প্রতি হিংসা প্রকাশ করবে। অনেকেই সেই দাঈকে ঘৃণা করবে, যে দাঈ হক কথা বলেন।

হুযাইফা ﷺ বলেছেন, 'মানুষের নিকট এমন এক যুগ আসবে, যখন তাদের নিকট একটি মরা গাধা সেই মু'মিন থেকে বেশী পছন্দনীয় হবে, যে সৎকর্মের আদেশ ও মন্দকর্মে বাধা দান করবে।'

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'যদি দেখ যে, কোন ব্যক্তি স্বীয় প্রতিবেশীদের নিকট প্রিয় এবং অন্যান্য লোকের নিকটে প্রশংসিত, তাহলে জেনে রেখো সে একজন খোশামুদে।' অর্থাৎ, সে সৎকর্মের আদেশ ও মন্দকর্মে বাধা

দান করে না। *(তফসীর কাশ্শাফ ১/৪২৬)*

লুকমান হাকীম তাঁর ছেলেকে বলেছিলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, হে বৎস ! যথারীতি নামায পড়, সৎকাজের নির্দেশ দাও, অসৎকাজে বাধা দান কর এবং তোমার উপর আসা বিপদে ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এটিই দৃঢ় সংকল্পের কাজ। *(লুক্বমানঃ ১৭)*

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রসূলগণ এবং তাদের জন্য (শাস্তি প্রার্থনায়) তাড়াতাড়ি করো না। *(আহক্বাফঃ ৩৫)*

আর ধৈর্য ধারণ করার ফলে যে সুফল লাভ হয়, তা বিশাল।

ঐ দেখুন না, এক দ্বীনের দাঈর এক যালেমের মারা থুথু গায়ে মেখে নেওয়ার ফলে সে যালেম অস্বাভাবিকভাবে পরিবর্তন হয়ে গেল!

এক দাঈ এক যালেমের কাছে মার খাওয়ার পরেও তার অসুখে তাকে দেখা করতে গেল। আর তার ফলে তার মনে নাটকীয় পরিবর্তন এল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। উৎকৃষ্ট দ্বারা মন্দ প্রতিহত কর; তাহলে যাদের সাথে তোমার শত্রুতা আছে, সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। *(হা-মীম সাজদাহঃ ৩৪)*

কিন্তু এ কাজ তো সবার নয়। এ কাজের জন্য পৃথক গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে। আর তার জন্যই মহান আল্লাহ তার পরেই বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, এ চরিত্রের অধিকারী কেবল তারাই হয়, যারা ধৈর্যশীল। এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা মহাভাগ্যবান। *(ঐঃ ৩৫)*

বিরোধী সমালোচকের সমালোচনায় কান না দিয়ে, নিজের কাজ নিজে ক'রে যেতে হবে। মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। *(হিজ্রঃ ৯৪)*

( ) { }

অর্থাৎ, তুমি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎকাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল। *(আ'রাফঃ ১৯৯)*

কেউ কোন অন্যায় করলে তার প্রতিশোধ না নিয়ে, কোন দুঃখ-দুশ্চিন্তা না ক'রে ধৈর্য ধারণপূর্বক ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করতে বলেছিলেন,

}

( )

( ) {

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে। আর যদি তোমরা ধৈর্যধারণ কর, তাহলে অবশ্যই ধৈর্যশীলদের জন্য সেটাই উত্তম। তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের (অবিশ্বাসের) জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। *(নাহলঃ ১২৭)*

দাওয়াতের কাজ বড় ধৈর্যের কাজ। ধৈর্যের কাজও বড় কঠিন কাজ। সুতরাং সে ব্যাপারে মহান আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে। তাহলে তিনি সে কাজের সাথী হবেন। তিনি বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন। *(বাক্বারাহঃ ১৫৩)*

দাওয়াতের কাজ, হকের অসিয়তের কাজ। কিন্তু সে কাজে সবরের অসিয়তও জরুরী। তা না হলে মু'মিনরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) ( ) }

( ) {

অর্থাৎ, মহাকালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয়। আর উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের। *(আস্রঃ ১-৩)*

যারা দাওয়াতের কাজে ইমাম হতে চায়, তাদের উচিত ধৈর্য ধরা, সহ্য করা, মানুষকে ক্ষমা করা। যে সয়, সে রয়। ধীর পানিতে পাথর কাটে, সবুরে

মেওয়া ফলে। ধৈর্য ছাড়া কি নেতা হওয়া যায়? মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, ওরা যেহেতু ধৈর্যশীল ছিল তার জন্য আমি ওদের মধ্য হতে নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুসারে মানুষকে পথপ্রদর্শন করত। ওরা ছিল আমার নিদর্শনাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাসী। *(সাজদাহঃ ২৪)*

দাওয়াতের কাজে ভয় নেই কোন। তবে এমন অনুচিত কাজ করা উচিত নয়, যা ভয়ের কারণ হতে পারে। যাঁরা আল্লাহর রিসালাতের তবলীগ করেন, তাঁরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় পান না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত; ওরা তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করত না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। *(আহযাবঃ ৩৯)*

অনেকে জুজুর ভয়ে দাওয়াতের কাজ করে না, সম্মান চলে যাওয়ার ভয়ে দাওয়াতের জন্য মুখ খোলে না। চাকরী চলে যাওয়ার ভয়ে দাওয়াতের মুখ বন্ধ রাখে। জেলে যাওয়ার ভয়ে দাওয়াতের হক কথা বলে না। এমন দুর্বলমনা হলে হয় না। মানসিক পরাজয়ের শিকার হয়ে দাওয়াতের কাজ হয় না।

অবশ্যই হিকমত অবলম্বন ক'রে লাঠি মাঝখানে ধরতে হবে, যাতে কোন দিকে ঝুঁকে হাতছাড়া না হয়ে যায়। ধৈর্য ধরতে হবে আল্লাহর পথে।

অকুতোভয় হওয়া মানে বেপরোয়া হওয়া নয়। নির্ভীক হওয়া মানে আগুনেও ঝাঁপ দিতে হবে, তা নয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে ফিতনা থেকে দূরে থাকতে বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় কর, যা বিশেষ ক'রে তোমাদের মধ্যে যারা অত্যাচারী কেবল তাদেরই ক্লিষ্ট করবে না এবং জেনে রাখ যে, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। *(আনফালঃ ২৫)*

নির্ভীক হয়ে সে রকম ফিতনা সৃষ্টি করা দাঈর উচিত নয়, যার মাশুল সারা মুসলিম-জাহানকে চুকাতে হয়। যার ফলে মুসলিমদের ভাবমূর্তি বিকৃত হয়। ইসলামের নামে লোকে নাক সিঁটকায়। ইসলাম শান্তির ধর্ম। সুতরাং ধৈর্যের সাথে শান্তি বজায় রেখে যদি বিজয় লাভ হয়, তাহলে সেটা 'ফাতহে মুবীন' বা স্পষ্ট বিজয় নয় কি?

আল্লাহর ওয়াস্তে প্রীতি ও বিদ্বেষ

আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব এবং তাঁরই ওয়াস্তে বিদ্বেষ করা প্রত্যেক মু'মিনের সদ্‌গুণ। দাঈও নিজের বন্ধুকে ভালবাসবে আল্লাহর ওয়াস্তে, প্রয়োজনে শত্রুকেও ভালবাসবে আল্লাহর ওয়াস্তে। শত্রুকে ঘৃণা করবে আল্লাহর ওয়াস্তে, প্রয়োজনে বন্ধুকেও ঘৃণা করবে আল্লাহর ওয়াস্তে। সারা সৃষ্টিকে ভালবাসবে আল্লাহর ওয়াস্তে, ঘৃণা করবে আল্লাহর ওয়াস্তে।

আল্লাহর ওয়াস্তে মানুষকে ভালবাসলে ঈমানের মিষ্টতা পাওয়া যায়, আর তার ফলে দাওয়াতের কাজে ও অন্যান্য ঈমানী কাজে বড় তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া যায়। নবী ﷺ বলেন, "যার মধ্যে তিনটি গুণ থাকে সে ঈমানের মিষ্টতা লাভ করে থাকে। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তার কাছে অন্য সব কিছু থেকে অধিক প্রিয় হবে; কাউকে ভালোবাসলে কেবল আল্লাহ'র জন্যই ভালবাসবে। আর কুফরী থেকে তাকে আল্লাহর বাঁচানোর পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে নিজেকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করাকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অনুরূপ উক্ত ভালবাসা ও ঘৃণা ঈমান পরিপূর্ণতার দলীল। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কিছু দান করা হতে বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অধিকারী।" *(সহীহ আবূ দাউদ ৩৯১০নং)*

পরস্পরে মধ্যে ভালবাসার সম্পর্ক রাখলে, পরস্পরের মধ্যে আসা-যাওয়া রাখলে, একে অপরের জন্য খরচ করলে আল্লাহর ভালবাসা লাভ হয়। আর তার ফলেই লাভ হয় মানুষের ভালবাসাও। সুতরাং সেই ভালবাসা ও সম্প্রীতি কাজে লাগে দাওয়াতে।

আবূ ইদ্রীস খাওলানী (রঃ) বলেন, আমি দিমাশ্কের মসজিদে প্রবেশ ক'রে এক যুবককে দেখতে পেলাম, তাঁর সামনের দাঁতগুলি খুবই চকচকে এবং তাঁর সঙ্গে কিছু লোকও (বসে) রয়েছে। যখন তারা কোন বিষয়ে মতভেদ করছে, তখন (সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর দিকে রুজু করছে এবং তাঁর মত গ্রহণ করছে। সুতরাং আমি তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, (ইনি কে? আমাকে) বলা হল, 'ইনি মুআয বিন জাবাল।' অতঃপর আগামী কাল আমি আগেভাগেই মসজিদ গেলাম। কিন্তু দেখলাম, সেই (যুবকটি) আমার আগে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। সুতরাং তাঁর নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করলাম। অতঃপর আমি তাঁর

সামনে এসে তাঁকে সালাম দিলাম। তারপর বললাম, 'আল্লাহর কসম! আমি আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসি।' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' পুনরায় তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম?' আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম।' অতঃপর তিনি আমার চাদরের আঁচল ধরে আমাকে তার দিকে টানলেন, তারপর বললেন, 'সুসংবাদ নাও। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, "আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ও ভালবাসা ওয়াজেব হয়ে যায়।" *(মুঅত্তা)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন তখন তিনি জিবরীলকে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, অতএব তুমিও তাকে ভালবাস। সুতরাং জিবরীলও তাকে ভালবাসতে লাগেন। অতঃপর তিনি আকাশবাসীদের মধ্যে ঘোষণা করে দেন যে, আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালবাসেন। কাজেই তোমরাও তাকে ভালবাসো। তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে লাগে। অতঃপর পৃথিবীতেও তাকে গ্রহণযোগ্য করার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ভালবাসার দাওয়াত ফলপ্রসূ, তবে তাতে খোশামোদ থাকলে হবে না। কারণ খোশামোদ ও তোষামোদ আল্লাহর ওয়াস্তে হয় না, বরং তা হয় নিজের স্বার্থে।

পক্ষান্তরে ঘৃণা সৃষ্টি ক'রে দাওয়াত, অপরের ইজতিহাদী ভুলকে কটাক্ষ ও ব্যঙ্গ ক'রে দাওয়াত ফলপ্রসূ নয়। তবে আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করতে হবে ঘৃণ্য ব্যক্তি ও বিষয়কে।

সুতরাং ভালবাসা ও ঘৃণার নিক্তি হতে হবে বড় সূক্ষ্ম, নচেৎ "সর্বনাশ তাদের জন্য, যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকের নিকট হতে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে এবং যখন তাদের জন্য মেপে অথবা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।"

কটাক্ষমূলক দাওয়াত স্বমতাবলম্বী মানুষদের কাছে খুবই প্রিয়। এই জন্য রাজনৈতিক বক্তাদের বাজার ভাল হয়। তাদের জনপ্রিয়তা ও প্রসিদ্ধি থাকে। বিরোধী দলকে কটাক্ষ ক'রে বক্তৃতা করলে শাবাশি পাওয়া যায়, হাততালি ও না'রায়ে তকবীর পাওয়া যায়। তাতে অনেক লাভ হয় বটে, কিন্তু ক্ষতিও কম হয় না। সরাসরি অভিঘাতে অনেক মানুষ উক্ত বক্তাকে মন থেকে সরিয়ে দেয়। আঘাত খেয়ে দূরে ছিটকে পড়ে। পারলে বক্তাকে

তক্তা বানিয়ে ছাড়ে।

সমালোচনামূলক ও আক্রমণাত্মক বক্তৃতায় জোশ থাকে, জনপ্রিয়তা থাকে, কিন্তু অনেক সময় ইনসাফ থাকে না। অনেক সময় বিরোধীদের নিয়ত ও উদ্দেশ্য বিচার করতে গিয়ে বক্তা নিজেই তাদের সমালোচনার শিকার হয়। ফলে তখন লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়। বাত ভাল করতে গিয়ে কুষ্ঠরোগ সৃষ্টি হয়। সমালোচনা করতে গিয়ে অপবাদ রচনা হয়।

অনেকে অনেক সময় কারো ব্যক্তিগত দোষ বয়ান করতে গিয়ে অন্যায়ভাবে গোটা দল, জাতি, দেশ বা বংশের দোষ বর্ণনা করে। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, "আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদদাতা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি (ব্যঙ্গ-কাব্যে) কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতা অস্বীকার ক'রে মাকে ব্যভিচারিণী বানায়!" *(ইবনে মাজাহ)*

আল্লাহর নবী ﷺ ভালবাসার নীতি বজায় রাখতেন। যেহেতু নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নসীহত করতে আদেশ করতেন গোপনে। আর কোন মানুষকে সভায় নসীহত করতে গেলে আমভাবে কথা বলতেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট কোন ব্যক্তির ব্যাপারে কোন অভিযোগ এলে তিনি (নাম নিয়ে) বলতেন না যে, "অমুকের কী হয়েছে?" বরং তিনি বলতেন, "লোকেদের কী হয়েছে যে, তারা এই এই বলে।" *(আবূ দাউদ)*

আনাস رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "লোকদের কী হয়েছে যে, তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে দৃষ্টি তুলছে? এ ব্যাপারে তিনি কঠোর বক্তব্য রাখলেন; এমনকি তিনি বললেন, তারা যেন অবশ্যই এ কাজ হতে বিরত থাকে; নচেৎ অবশ্যই তাদের দৃষ্টি-শক্তি কেড়ে নেওয়া হবে। *(বুখারী)*

একদা তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এল। তারা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর যখন তাদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল, তখন তারা যেন তা অল্প মনে করল এবং বলল, 'আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক'রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।' সুতরাং তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।' দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।' তৃতীয়জন বলল, 'আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এ খবর গেলে তিনি আল্লাহর প্রশংসা ক'রে বললেন, "লোকেদের কী হয়েছে যে,

তারা এই এই বলে। শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।” *(বুখারী-মুসলিম, প্রমুখ)*

অবশ্য ব্যাপার যদি গুরুতর হয়, স্পষ্ট ভ্রষ্টতা থেকে মানুষকে সতর্ক করতে হয় এবং তা আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ পোষণের ব্যাপার হয়, তাহলে নাম নেওয়া জরুরীও হতে পারে। তবে সেটাও হল ওজনের ব্যাপার। সূক্ষ্ম ওজন ছাড়া পদস্খলন ঘটতেই পারে।

পক্ষান্তরে দাওয়াতের আগে দাঈর উচিত মানুষের সাথে পরিচয় লাভ করা। দাওয়াত দেওয়ার আগে মনের আকর্ষণ সৃষ্টি করা। মুখে মিষ্টি হাসির সদকা বিলিয়ে মানুষের মন জয় করা। 'সালাম'-এর হাদিয়া পেশ ক'রে সম্প্রীতির ডোরে মানুষকে বেঁধে ফেলা। শহরের মসজিদে অধিকাংশ এমন হয়ে থাকে, একটা বছর একটানা পাঁচ-ওয়াক্ত নামায পড়লাম, কিন্তু একটা দিনও ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন না যে, আমি কে? কী করি? কোথায় থাকি?

পক্ষান্তরে ইসলামী লেবাসে থাকি বলে, অনেক সাহেব মনে করেন, আমি কোন মাদ্রাসার আদায়কারী বুঝি। আর সে ক্ষেত্রে চাঁদা দেওয়ার ভয়ে নামায পড়ে সটাং গা ঢাকা দেন।

মনে-মনে এমন দূরত্ব রাখলে হতভাগা উভয়েই। আর যে দাওয়াতকে এড়িয়ে চলতে চায়, সে সবচেয়ে বড় হতভাগা বৈ কি? দুনিয়ার ভোজের দাওয়াতে যে 'ভোজের আগে, রণের পিছে' বলে আগে আগে থাকে, সে আখেরাতের দাওয়াতে পিছনে থেকে যায়। তার মতো বঞ্চিত প্রবঞ্চিত মানুষ কি দ্বিতীয়টি আছে?

বর্তমান পরিস্থিতির ধারণা

বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা থাকা আবশ্যক দাঈর। বিশ্বজনমতের প্রবণতা এবং ব্যক্তি ও সমাজের উপর তার প্রতিক্রিয়ার সম্যক্ জ্ঞান থাকতে হবে দাঈর। দ্বীন-বিরোধী বিভিন্ন মিশন, সংগঠন, দল, জাতি ও দেশ সম্বন্ধে পরিচয় লাভ করতে হবে দাঈকে। কুফরীর ছোবল, মুনাফিক্বীর বিশ্বাসঘাতকতার দংশন, পাপাচারের তুফান ও বিদআতের ঘুণ চিনতে না পারলে মুসলিমদের বিপদ যে অনিবার্য।

মুসলিমদের জন্য অনিষ্টকর বস্তুসমূহকে চেনা ওয়াজেব, যাতে দাঈ নিজে তা থেকে বাঁচতে পারে এবং অপরকেও বাঁচাতে পারে। যেমন আরবী কবি বলেন,

'মন্দ জেনেছি বাঁচিবার লাগি নহে মন্দের তরে,
ভালো কি মন্দ চিনে না যে সে মন্দেতে গিয়ে পড়ে।'

অবশ্য এর মর্মার্থ হাদীস শরীফ থেকে গৃহীত। সাহাবী হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান ﵁ বলেন, “লোকেরা রসূল ﷺ-কে ইষ্টকর ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত আর আমি কবলিত হবার আশংকায় তাঁকে অনিষ্টকর ও অমঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

উমার বিন খাত্তাব ﵁ বলেন, 'সে ব্যক্তি ইসলামকে এক খি এক খি ক'রে (ধীরে ধীরে) নষ্ট ক'রে ফেলে, যে ব্যক্তি ইসলামে লালিত-পালিত হয়, আর জাহেলিয়াতকে চেনে না।' অথবা 'ইসলাম-রশির খি একটা একটা ক'রে নষ্ট হয়ে যাবে, যদি ইসলামে এমন ব্যক্তি লালিত-পালিত হয়, যে জাহেলিয়াতকে চেনে না।' *(মাজমূউ ফাতাওয়া, ইবনে তাইমিয়্যাহ ১০/৩০১, মাদারিজুস সালিকীন ১/৩৪৩)*

সজাগ ও সতর্ক থাকার জন্য ইসলাম-পরিপন্থী বিষয় জানার আবশ্যকতা আছে। নিরাপদ থাকার জন্য শত্রুপক্ষের নানা চক্রান্ত সম্পর্কে জ্ঞানলাভ জরুরী আছে। আলোর কদর স্পষ্ট করার জন্য অন্ধকার জানার প্রয়োজন আছে। আর এ জন্যই মা'বূদ চেনার সাথে সাথে তাগূত, ঈমান চেনার সাথে সাথে কুফরী, তাওহীদ জানার সাথে সাথে শির্ক, সুন্নাহ জানার সাথে সাথে বিদআত এবং হক জানার সাথে সাথে বাতিলকে জানা একান্ত জরুরী। আরবী কবি বলেন,

.....
.....

অর্থাৎ,

প্রভাত হেন শুভ্র-সাদা মুখখানি অতুল,
রাতের অন্ধকারের মতো কৃষ্ণ-কালো চুল।
দুই বিপরীত জমা হলে দেখায় মনোলোভা,
বিপরীত স্ববিপরীতের প্রকাশ করে শোভা।

বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা যার নেই, সে যথার্থ দাঈ হতে পারে না। কিতাব-সুন্নাহর বড় আলেম হলেও বাস্তব পরিবেশের জ্ঞান থাকতে হবে। নচেৎ তিনি হবেন সেই ডাক্তারের মতো, যাঁর কাছে ওষুধের গুদাম আছে, কিন্তু রোগ-ব্যাধি চেনেন না। পক্ষান্তরে যিনি বাস্তব জীবন সম্বন্ধে বড় অভিজ্ঞ, কিন্তু তাঁর কাছে কিতাব ও সুন্নাহর ইল্‌ম নেই, তিনি সেই ডাক্তারের মতো, যিনি রোগ-ব্যাধি চেনেন, কিন্তু তাঁর কাছে ওষুধ নেই।

দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না---এই ধারণা প্রবল হলেও দাওয়াত দিতে হবে

বিচিত্র এ ভুবনে নানা মানুষের নানা রকম মন। কিন্তু কার মন কেমন, দাঈ তা নাও জানতে পারে। মানুষের মন আল্লাহর হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে। তিনিই ইচ্ছামতো ঘুরান-ফিরান। হিদায়াত তিনিই দেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে যাকে চান, তাকে হিদায়াত দেন।

}

( ) {

অর্থাৎ, কাকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন ক'রে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, সে ব্যক্তি কি তার সমান (যে সৎকাজ করে)? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ ক'রে নিজেকে ধ্বংস করো না। নিশ্চয় ওরা যা করে, আল্লাহ তা খুব জানেন। *(ফাত্বির ঃ ৮)*

তবে মানুষের এখতিয়ার আছে। সে নিজ এখতিয়ার অনুযায়ী সৎ-অসৎ পথ অবলম্বন করতে পারে। যদিও মানুষের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছার অনুসারী।

( ) ( ) }

( ) {

অর্থাৎ,এ তো শুধু বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ মাত্র; তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায় তার জন্য। আর বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তোমরা কোনই ইচ্ছা করতে পার না। *(তাকবীর ঃ ২৭-২৯)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে সরল পথ ও জ্ঞান দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে তা ঐ বৃষ্টি সদৃশ, যা যমীনে পৌঁছে। অতঃপর তার উর্বর অংশ নিজের মধ্যে শোষণ করে। অতঃপর তা ঘাস এবং প্রচুর শাক-সব্জি উৎপন্ন করে। এবং তার এক অংশ চাষের অযোগ্য (খাল জমি); যা পানি আটকে রাখে। ফলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারা মানুষকে উপকৃত করেন। সুতরাং তারা তা হতে পান করে এবং (পশুদেরকে) পান করায়, জমি সেচে ও ফসল ফলায়। তার আর এক অংশ শক্ত সমতল ভূমি; যা না পানি শোষণ করে, না ঘাস উৎপন্ন করে। এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির যে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করল এবং আমি যে হেদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে প্রেরিত হয়েছি তার দ্বারা আল্লাহ তাকে উপকৃত করল। সুতরাং সে (নিজেও) শিক্ষা

করল এবং (অপরকেও) শিক্ষা দিল। আর এই দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তিরও যে এ ব্যাপারে মাথাও উঠাল না এবং আল্লাহর সেই হেদায়াতও গ্রহণ করল না, যা দিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

দাঈ দ্বীনের দাওয়াত দেয়। কিন্তু হিদায়াত দিতে পারে না। হিদায়াত আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা হিদায়াত করেন। তাছাড়া গায়বের খবর আল্লাহর কাছে। কেবল তিনিই জানেন কে হিদায়াত পাবে, আর কে পাবে না। তিনি বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, বল, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করে থাকে। অতঃপর যে পরিপূর্ণরূপে সৎপথপ্রাপ্ত তার সম্বন্ধে তোমার প্রতিপালক সম্যক্ অবগত আছেন।' *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৮৪)*

( ) { }

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক অধিক অবগত আছেন যে, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে এবং তিনি অধিক জানেন, কারা সৎপথপ্রাপ্ত। *(ক্বালাম ঃ ৭)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহবান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয়, সে সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে তাও সবিশেষ অবহিত। *(নাহল ঃ ১২৫)*

}

( ) {

অর্থাৎ, এভাবে আমি নিজ নির্দেশে তোমার প্রতি অহী (প্রত্যাদেশ) করেছি রূহ। তুমি তো জানতে না গ্রন্থ কি, ঈমান (বিশ্বাস) কি। পক্ষান্তরে আমি একে করেছি এমন আলো, যার দ্বারা আমি আমার দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। আর নিশ্চয়ই তুমি সরল পথ প্রদর্শন কর। *(শূরা ঃ ৫২)*

( ) { }

অর্থাৎ, আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে কেউ উপদেশ গ্রহণ করবে না।

একমাত্র তিনিই ভয়ের যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার অধিকারী। *(মুদ্দাষ্যির ঃ ৫৬)*

( ) ( ) ( ) }

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) { ( ) ( )

অর্থাৎ, সে ভ্রূ কুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। যেহেতু তার নিকট অন্ধ লোকটি আগমন করেছিল। তোমাকে কিসে জানাবে? হয়তো বা সে পরিশুদ্ধ হত অথবা উপদেশ গ্রহণ করত, ফলে তা তার উপকারে আসত। পক্ষান্তরে যে লোক বেপরোয়া, তুমি তার প্রতি মনোযোগ দিলে। অথচ সে পরিশুদ্ধ না হলে তোমার কোন দোষ নেই। পক্ষান্তরে যে তোমার নিকট ছুটে এল, সভয় মনে, তুমি তার প্রতি বিমুখ হলে! কক্ষনো (এরূপ করবে) না। এটা তো উপদেশবাণী; যে ইচ্ছা করবে, সে তা স্মরণ রাখবে (ও উপদেশ গ্রহণ করবে)। *(আবাসা ঃ ১-১২)*

একদা নবী ﷺ-এর নিকট কুরাইশ (কাফের)দের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ বসে কথা-বার্তা বলছিল। এমতাবস্থায় হঠাৎ আব্দুল্লাহ বিন উম্মে মাকতূম ؓ উপস্থিত হলেন। তিনি একজন অন্ধ মানুষ ছিলেন। আসা মাত্র নবী ﷺ-কে দ্বীনের কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তিনি তাঁর প্রতি কিছুটা বিরক্তিভাব পোষণ করলেন এবং তার প্রতি অমনোযোগী হলেন। তাই সতর্কতাস্বরূপ এই আয়াতগুলি অবতীর্ণ হল। *(তিরমিযী)*

দুর্বল শ্রেণীর লোকেদেরও কদর করা উচিত, তাদের ব্যাপারে বৈমুখ হওয়া উচিত নয়। উক্ত আয়াতগুলি দ্বারা জানা যায় যে, দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ইতর-বিশেষ করা উচিত নয়। বরং মর্যাদাবান ব্যক্তি হোক চাই অমর্যাদাবান, রাজা হোক চাই ফকীর, সর্দার হোক কিংবা গোলাম, পুরুষ হোক অথবা নারী, ছোট হোক চাই বড় সকলকে একই মর্যাদা দান করা এবং সমষ্টিগতভাবে সম্বোধন করা উচিত। আল্লাহ তাআলা যাকে চাইবেন নিজের হিকমতানুযায়ী তাকে হিদায়াত দেবেন। *(ইবনে কাসীর)*

গরীব-মিসকীন ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া আর ধনবান ব্যক্তির প্রতি খাস মনোযোগ দেওয়া ঠিক নয়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে সকলকেই এক পাল্লায় মাপতে হবে। প্রত্যেক দাঈর জন্য এতে সেই সতর্কবাণী রয়েছে।

আবূ তালেবের যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিন। আমি

আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। এই কলেমা দলীল স্বরূপ পেশ ক'রে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করব।"

কিন্তু পাশে বড় বড় নেতারা বসে ছিল। আবূ জাহ্ল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া বলল, 'আপনি কি শেষ অবস্থায় বিধর্মী হয়ে মরবেন? আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?'

যতবার মহানবী ﷺ তাঁর উপর পরিত্রাণের জন্য ঐ কালেমা পেশ করলেন, ততবার তারা তা নাকচ ক'রে দিল। ফলে কলেমা না পড়েই তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হল। মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ ক'রে নবীকে বললেন,

{ }

অর্থাৎ, কাকেও প্রিয় মনে করলে তুমি তাকে সৎপথে আনতে পারবে না, তবে আল্লাহই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনেন এবং তিনিই ভাল জানেন কারা সৎপথের অনুসারী। *(ক্বাস্বাস ঃ ৫৬)*

মহান আল্লাহ জানতেন যে, ফিরআউন ঈমান আনবে না। তবুও তিনি হুজ্জত কায়েম করার জন্য মূসা ও হারূন (আলাইহিমাস সালাম)কে তার কাছে পাঠিয়েছিলেন; বলেছিলেন,

{ }

অর্থাৎ, তোমরা দু'জন ফিরাউনের নিকট যাও, সে তো সীমালংঘন করেছে। তোমরা তার সাথে নম্র কথা বলবে, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে, অথবা ভয় করবে। *(ত্বাহা ঃ ৪৩-৪৪)*

হিদায়াত আল্লাহর হাতে, তবুও মানুষ হিদায়াত করতে ছাড়বে না। কারণ তাতে হিদায়াতকারীরও লাভ আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এ জন্য।' *(আ'রাফ ঃ ১৬৪)*

এই দল বলতে ঐ সকল সীমালংঘনকারী আল্লাহর অবাধ্যদেরকে বুঝানো হয়েছে, যখন তাদেরকে উপদেশ দানকারীরা উপদেশ দিত, তখন তারা বলত যে, যখন তোমাদের ধারণায় আমাদের ভাগ্যে ধ্বংস ও আল্লাহর আযাবই আছে, তাহলে আমাদেরকে উপদেশ দাও কেন? তারা উত্তরে

বলত, প্রথমতঃ প্রতিপালকের নিকট ওযর পেশ করার জন্য, যাতে আমরাও আল্লাহর পাকড়াও হতে বাঁচতে পারি। কারণ, পাপ করতে দেখা এবং বাধা দেওয়ার চেষ্টা না করাও এক পাপ। যার উপর আল্লাহর পাকড়াও হতে পারে। আর দ্বিতীয়তঃ হয়ত-বা লোকেরা আল্লাহর আদেশ লংঘন করা হতে বিরত থাকতে পারে।

সুতরাং দাঈকে নিজের ওয়াজেব আদায় করতে হবে। মহান আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে হিদায়াত করবেন।

অবশ্য যেখানে সুনিশ্চিত যে, দাওয়াত গ্রহণযোগ্য হবে না এবং দাওয়াত পেশ করলে হেনস্থার শিকার হতে হবে, সেখানে নিজেকে অপমানিত করা মু'মিনের উচিত নয়। যেখানে ফিতনার শিকার হয়ে বিপদগ্রস্ত হতে হবে, সেখানে নিজেকে বিপর্যস্ত করা উচিত নয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিজেকে লাঞ্ছিত করা কোন মুমিনের উচিত নয়।" সাহাবাগণ বললেন, 'সে নিজেকে লাঞ্ছিত কীভাবে করে হে আল্লাহর রসূল?' উত্তরে তিনি বললেন, "সেই বিপদকে সে বহন করতে চায়, যা বহন করার ক্ষমতা সে রাখে না।" *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ৬১৩নং)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, অতএব উপদেশ দাও; যদি উপদেশ ফলপ্রসূ হয়। *(আ'লাঃ ৯)*

দাওয়াত ও উপদেশ সকলকেই দেওয়া হয়, তবে যারা মু'মিন, কেবল তারাই উপকৃত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তুমি উপদেশ দিতে থাক, কারণ উপদেশ বিশ্বাসীদের উপকারে আসবে। *(যারিয়াতঃ ৫৫)*

যাদের মনে ভয় আছে, তারাই উপদেশ দ্বারা উপকৃত হয়। আল্লাহ বলেন,

( ) { ( ) }

অর্থাৎ, যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর নিতান্ত হতভাগ্য তা উপেক্ষা করবে। *(আ'লাঃ ১০-১১)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে সে আর অন্ধ কি সমান? কেবলমাত্র জ্ঞানী

ব্যক্তিরাই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে। *(রা'দঃ ১৯)*

}

( ) {

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রিকালে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে ইবাদত করে, পরকালকে ভয় করে এবং তাঁর প্রতিপালকের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, (সে কি তার সমান, যে তা করে না?) বল, 'যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান? বুদ্ধিমান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' *(যুমারঃ ৯)*

{ }

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখান এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য রুযী প্রেরণ করেন; আর (আল্লাহর) অভিমুখী ব্যক্তিই উপদেশ গ্রহণ ক'রে থাকে। *(মু'মিনঃ ১৩)*

দাঈর কাজ দাওয়াত দেওয়া। তাতে লাভ হবে, না হবে সে বিচার করার মালিক আল্লাহ। আল্লাহ চাইলে হিদায়াত হবে, আর না চাইলে দাঈর সওয়াব তো হবে। দাওয়াতও দুআর মতো। কখনো কবুল হয়, কখনো হয় না। তা বলে দুআ করা বৃথা যায় না। কম-সে-কম মানুষের উপর আল্লাহর হুজ্জত তো কায়েম হবে।

ফললাভে শীঘ্রতা

দাঈর উচিত, দাওয়াতের ফললাভে শীঘ্রতা না করা। ফল দেখা না দিলেও দাওয়াত চালিয়ে যাওয়া।

হিদায়াত আল্লাহর হাতে। মানুষ গাছ লাগায়, যত্ন করে। কিন্তু ফুল-ফল সে সৃষ্টি করতে পারে না। সৃষ্টি করার কাজ তো আল্লাহরই।

উচিত নয়, দর্স দিতে দিতে বন্ধ ক'রে দেওয়া। দাওয়াতের কাজ করতে করতে ছেড়ে দেওয়া। তাদরীসের কাজ চালাতে চালাতে বন্ধ ক'রে দেওয়া। অপবাদ আসলে আসতে পারে, শীতের প্রকোপে গাছের পাতা ঝড়ে যেতে পারে। তা বলে কি নতুন পাতা আর গজাবে না? তৈরি গাছ ছাগল-গরুতে মুড়িয়ে খেতে পারে। কিন্তু তা বলে কি নতুন ডাল-পালা আর গজাবে না?

দাওয়াতী কাজের চাকরি গেলে যেতে পারে, তা বলে কি দাওয়াতী কাজও বন্ধ হয়ে যাবে? দাওয়াতের কাজের কি অবসরপ্রাপ্তি আছে?

কেউ শোনে না আপনার কথা? কেউ মানে না আপনার উপদেশ? তা বলে কি উপদেশ বন্ধ ক'রে দেবেন? ফল আসতে দেরি দেখে কি গাছ কেটে ফেলে দেবেন?

নবীগণই কি সকলকে হিদায়াত দিতে পেরেছিলেন? ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমার কাছে সকল উম্মত পেশ করা হল। আমি দেখলাম, কোন নবীর সাথে কতিপয় (৩ থেকে ৭ জন অনুসারী) লোক রয়েছে। কোন নবীর সাথে এক অথবা দুইজন লোক রয়েছে। কোন নবীকে দেখলাম তাঁর সাথে কেউ নেই!" *(বুখারী-মুসলিম)*

আর আপনি তো নবীও নন। আপনি হতে পারেন, সেই শ্রেণীর। কিন্তু সওয়াব থেকে তো বঞ্চিত হবেন না।

কেউ ৩০ বছরে ৩টি লোক হিদায়াত করতে পারে না। আবার কেউ ৩ দিনে ৩০টি লোক হিদায়াত ক'রে ফেলেন। আল্লাহ যাকে তওফীক দেন, তার দ্বারা তিনি হিদায়াতের কাজ নেন। চেষ্টার ত্রুটি না থাকা সত্ত্বেও যদি কারো হাতে কেউ হিদায়াত না পায়, তাহলে কি রাগ ও ক্ষোভের কিছু আছে? তাড়াহুড়া ও ধৈর্যহীনতার কিছু আছে?

শুনুন, আল্লাহ তাঁর নবীকে কী বলেন,

{ }

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি তিমি-ওয়ালা (ইউনুস)এর মত অধৈর্য হয়ো না, যখন সে বিষাদ আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। *(ক্বালাম ঃ ৪৮)*

আসলে হিদায়াত আল্লাহর হাতে, আযাবও তাঁর হাতে। তাতে তাড়াহুড়া করলে তো ফল হয় না।

মহান আল্লাহ তিমি-ওয়ালা নবীর কথা স্মরণ করতে বলেছেন,

}

( )

( ) {

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যুন-নুন (ইউনুস)এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গেল এবং মনে করল আমি তার প্রতি কোন সংকীর্ণতা করব না। অতঃপর সে অনেক অন্ধকার হতে আহবান করল, 'তুমি ছাড়া কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তুমি পবিত্র, মহান। নিশ্চয় আমি সীমালংঘনকারী।' তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে উদ্ধার করলাম দুশ্চিন্তা হতে এবং এভাবেই আমি মু'মিনদেরকে উদ্ধার ক'রে থাকি। *(আম্বিয়া ঃ ৮৭-৮৮)*

ইউনুস ﵇-কে ইরাকের নীনাওয়া (বর্তমান মাওসেল) নামক শহরে নবী ক'রে প্রেরণ করা হয়েছিল। এখানে আশুরীদের শাসন ছিল, যারা এক লক্ষ বানী ইস্রাঈলকে বন্দী ক'রে রেখেছিল, সুতরাং তাদের হিদায়াত ও

পথপ্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তাআলা তাদের নিকট ইউনুস ﵇-কে প্রেরণ করলেন। কিন্তু তারা তাঁর উপর ঈমান আনল না। শেষে তিনি নিজ সম্প্রদায়কে এই বলে ভীতিপ্রদর্শন করলেন যে, তোমরা অতি সত্বর আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হবে। শাস্তি আসতে বিলম্ব দেখে তিনি আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই ক্ষুব্ধ হয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং সমুদ্রে গিয়ে এক নৌকায় সওয়ার হন। নিজের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াকে এমন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন একজন দাস তার মনিব থেকে পালিয়ে যায়। কারণ তিনিও আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজ সম্প্রদায়কে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যাত্রী ও মাল-সামানে নৌকা পরিপূর্ণ ছিল। নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে পড়ে যায় ও দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং তার ভার কম করার জন্য এক ব্যক্তিকে নৌকা থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে নৌকার অন্য সব যাত্রীরা বেঁচে যায়। কিন্তু এই কুরবানী দেওয়ার জন্য কেউ তৈরী ছিল না, যার জন্য লটারী করতে হয়। সে লটারীতে ইউনুস ﵇-এর নাম আসে এবং তিনি অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান; অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পালিয়ে যাওয়া দাসের মত নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হয়। এদিকে আল্লাহ তাআলা তিমি মাছকে আদেশ করেন যে, তাঁকে যেন পূর্ণ গিলে ফেলে। এই ভাবে ইউনুস ﵇ আল্লাহর আদেশে মাছের পেটে চলে যান। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে মিনতি সহকারে দুআ করলে, তিনি তাঁকে উদ্ধার করেন। *(আহসানুল বায়ান)*

আমাদের নবী তায়েফে তাড়াহুড়া করলেন না। তিনি বলেন, "আমি তায়েফ থেকে প্রস্থান করলাম। সে সময় আমি নিদারুণ বেদনা ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম। 'ক্বারনুয যাআলিব' (বর্তমানে আস-সাইলুল কাবীর; যা রিয়ায ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদের মীকাত)-এ এসে পরিপূর্ণ চৈতন্যপ্রাপ্ত হই। মাথা তুলে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি, একখন্ড মেঘ আমাকে ছায়া করে আছে। লক্ষ্য করে দেখি তাতে জিবরীল ﵇ রয়েছেন। তিনি আমাকে আহবান জানিয়ে বললেন, 'আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে এবং আপনার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করেছে আল্লাহ তার সবকিছুই শুনেছেন ও দেখেছেন। এক্ষণে তিনি পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তাকে আপনার খিদমতে প্রেরণ করেছেন। আপনি ওদের ব্যাপারে তাঁকে যা ইচ্ছা নির্দেশ প্রদান করুন।' অতঃপর পর্বত-নিয়ন্ত্রণকারী ফিরিশ্তা আমাকে আহবান জানিয়ে সালাম দিয়ে বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! আপনার সম্প্রদায় আপনাকে যা বলেছে নিশ্চয় আল্লাহ তা শুনেছেন। আর আমি পর্বতের ফিরিশ্তা। আপনার প্রতিপালক আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করেছেন।

আপনি ওদের ব্যাপারে আমাকে যা ইচ্ছা তাই নির্দেশ দিন। যদি আপনি চান যে, আমি মক্কার দুই পাহাড়কে একত্রিত করে ওদেরকে পিষে ধ্বংস করে দিই, তাহলে তাই হবে।' কিন্তু আমি বললাম, "না, বরং আমি এই আশা করি যে, আল্লাহ ঐ জাতির পৃষ্ঠদেশ হতে এমন বংশধর সৃষ্টি করবেন; যারা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। *(বুখারী + মুসলিম)*

কিছু মানুষের বাধায় ইসলামের ক্ষতি হচ্ছিল, মুসলিমদের ক্ষতি হচ্ছিল। তিনি নামাযে রুকূর পর তাদের জন্য বদ্দুআ করতে লাগলেন। মহান আল্লাহ বললেন,

{ }

অর্থাৎ,এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী। *(বুখারী)*

উহুদ-যুদ্ধে দয়ার নবী আঘাতে দুঃখ পেলেন, তাঁর চোয়ালের দাঁত ভেঙ্গে গেল, মাথা ফুটে রক্ত ঝরল। রক্ত মুছতে মুছতে তিনি বললেন, "সেই জাতি কীভাবে সফল হতে পারে, যে জাতি তাদের নবীকে রক্তাক্ত করে ও তার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে, অথচ সে তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহবান করে?!" *(বুখারী-মুসলিম)*

মহান আল্লাহ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বললেন,

{ }

অর্থাৎ,এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী। *(আলে ইমরান ঃ ১২৮)*

বলাই বাহুল্য যে, উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বহু লোক সফল হয়েছিল। মহান আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত করেছিলেন।

দাঈর কেউ আজ দুশমন থাকতে পারে, কিন্তু সেই দুশমন কাল বন্ধুতে পরিণত হতে পারে। মানুষের মন আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে। কখন তিনি ঘুরিয়ে দেন, কে জানে? সুতরাং তাড়াহুড়ার কী আছে?

এমন কিছু গাছ আছে, যার ফল তারা খেতে পায়নি, যারা তা লাগিয়েছে। তারা গাছ লাগিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে, আমরা তার ফল খাচ্ছি। আমরা গাছ লাগাচ্ছি, আমরা তার ফল খেতে না পেলেও আমাদের পরবর্তী বংশধরেরা খেতে পাবে। অতএব ফললাভে জলদি কেন? আপন সময়ে ফল ধরবে। খানে-ওয়ালা ঠিক খেতে পাবে। 'হর দানাতে লেখা আছে খানে-ওয়ালার নাম।'

দাওয়াত অগ্রাহ্য হলে রাগ ও আফসোস না করা

হিদায়াত মহান আল্লাহর হাতে। কেউ হিদায়াত না পেলে তার পশ্চাতে রাগ বা আফসোস হওয়া উচিত নয়। অবশ্য মুখলিস দাঈর মনে দুঃখ হবে। কিন্তু তার করার কিছু নেই। পথ দেখানো দাঈর কাজ, আর পথে চালানো আল্লাহর কাজ। দাঈর কাজ পৌঁছে দেওয়া, আর আল্লাহর কাজ হিসাব নেওয়া।

পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, ইউনুস নবী ﷺ নিজের জাতির উপর রাগান্বিত হয়ে এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাবের ভয় দেখিয়ে, আল্লাহর বিনা অনুমতিতে সেখান হতে পলায়ন করেছিলেন। মহান আল্লাহর তা পছন্দ ছিল না। যার কারণে আল্লাহ তাঁকে পাকড়াও করলেন এবং সমুদ্র সফরে এক বড় তিমি মাছ তাঁকে গিলে ফেলল।

যখন ইউনুস ﷺ দেখলেন যে, তাঁর দাওয়াত ও তবলীগে তাঁর সম্প্রদায় প্রভাবিত হচ্ছে না, তখন তিনি নিজ সম্প্রদায়কে জানিয়ে দিলেন যে, অমুক দিন তোমাদের উপর আল্লাহর আযাব আসবে এবং তিনি নিজে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যখন মেঘের মত তাদের উপর আযাবের লক্ষণাদি দেখা দিল, তখন তারা শিশু, নারী এমনকি জীবজন্তু সমেত এক মাঠে সমবেত হল এবং আল্লাহর দরবারে কাকুতি-মিনতির সাথে তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে আরম্ভ করল। আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল ক'রে তাদের উপর থেকে আযাব রহিত ক'রে দিলেন। ইউনুস ﷺ পথচারী পথিকের নিকট থেকে নিজ সম্প্রদায়ের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি যখন জানতে পারলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর সম্প্রদায়ের উপর থেকে আযাব রহিত ক'রে দিয়েছেন, তখন যেহেতু সেই সম্প্রদায় তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল, তাই তিনি সেই সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাওয়া পছন্দ করলেন না। বরং তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি অন্য কোন দিকে চলে গেলেন।

ইউনুস ﷺ শাস্তি আসতে বিলম্ব দেখে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজ জাতির এলাকা থেকে বেরিয়ে পড়েন এবং সমুদ্রে গিয়ে এক নৌকায় সওয়ার হন। নিজের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়াকে এমন শব্দে ব্যবহার করা হয়েছে, যেন একজন দাস তার মনিব থেকে পালিয়ে যায়। কারণ তিনিও আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই নিজ সম্প্রদায়কে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। যাত্রী ও মাল-

সামানে নৌকা পরিপূর্ণ ছিল। নৌকা সমুদ্রের ঢেউয়ের মাঝে পড়ে যায় ও দাঁড়িয়ে যায়। সুতরাং তার ভার কম করার জন্য এক ব্যক্তিকে নৌকা থেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, যাতে নৌকার অন্য সব যাত্রীরা বেঁচে যায়। কিন্তু এই কুরবানী দেওয়ার জন্য কেউ তৈরী ছিল না, যার জন্য লটারী করতে হয়। সে লটারীতে ইউনুস ﵇-এর নাম আসে এবং তিনি অসহায়দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান; অর্থাৎ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় পালিয়ে যাওয়া দাসের মত নিজেকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে হয়। এদিকে আল্লাহ তাআলা তিমি মাছকে আদেশ করেন যে, তাঁকে যেন পূর্ণরূপে গিলে ফেলে। এইভাবে ইউনুস ﵇ আল্লাহর আদেশে মাছের পেটে চলে যান। কুরআনে তাঁর সেই ইতিহাস বিভিন্ন স্থানে উল্লিখিত হয়েছে। এক স্থানে মহান আল্লাহ বলেন,

(   )   (   )   }

(   )   (   )

(   )   (   )

(   )   (   )

(   ) {   (   )

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইউনুসও ছিল রসূলদের একজন। স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন ক'রে বোঝাই জলযানে পৌঁছল, অতঃপর লটারি হলে সে হেরে গেল। পরে (তাকে নৌকা হতে সমুদ্রে ঠেলে দেওয়া হলে) এক বিরাট মাছ তাকে গিলে ফেলল, তখন সে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল। সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না করত, তাহলে সে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত মাছের পেটে থেকে যেত। অতঃপর ইউনুসকে আমি গাছ-পালাহীন সৈকতে নিক্ষেপ করলাম। পরে আমি (তাকে ছায়া দেওয়ার জন্য) এক লাউগাছ উদ্গত করলাম ; তাকে আমি এক লাখ বা তার বেশী লোকের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম এবং তারা বিশ্বাস করেছিল; ফলে তাদেরকে কিছুকালের জন্য জীবনোপভোগ করতে দিলাম। *(স্বাফ্‌ফাতঃ ১৩৯-১৪৮)*

মহান আল্লাহ শেষনবী ﷺ-কে সতর্ক ক'রে উক্ত ইউনুস ﵇-এর মত আচরণ করতে নিষেধ করেছেন।

}

(   )   (   )

(   ) {

অর্থাৎ, অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর তোমার প্রতিপালকের নির্দেশের অপেক্ষায়, তুমি তিমি-ওয়ালা (ইউনুস)এর মত অধৈর্য হয়ো না, যখন সে বিষাদ-আচ্ছন্ন অবস্থায় কাতর প্রার্থনা করেছিল। তার প্রতিপালকের অনুগ্রহ তার নিকট না পৌঁছলে, সে নিন্দিত হয়ে নিক্ষিপ্ত হত গাছ-পালাহীন সৈকতে। পুনরায় তার প্রতিপালক তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। *(ক্বালামঃ ৪৮-৫০)*

অমুক লোক ঈমান আনেনি, অমুক লোক আপনার দাওয়াত গ্রহণ করেনি, অমুক লোক আপনার উপদেশ পালন করেনি, অমুক লোক আপনার দাওয়াতের বিরোধিতা করছে---তাতে আপনার কী? সে দাওয়াত কি আপনার, না আল্লাহর? যদি আপনার হয়, তাহলে আপনার রাগ ও ক্ষোভ হওয়ার কথা বটে। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহর হয়, তাহলে আপনার রাগ করার কোন কারণ থাকতে পারে না। যেহেতু আপনার না হিদায়াত করার ইচ্ছা পূরণ করার ক্ষমতা আছে, আর না হিদায়াতের মালিকানা আপনার হাতে আছে। আপনি হিদায়াতের বীজ ছড়াতে পারেন, কিন্তু তার গাছ ও ফুল-ফল উৎপন্ন করার মালিক আপনি নন। তার মালিক একমাত্র আল্লাহ। ঐ দেখুন না, মহান আল্লাহ বলেন,

(   ) {   (   )   }

অর্থাৎ, তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? তোমরা কি ওকে অঙ্কুরিত কর, না আমি অঙ্কুরিত করি? *(ওয়াক্বিআহঃ ৬৩-৬৪)*

অনুরূপ দাওয়াত ও হিদায়াতও। তা যদি আপনার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয়, তাতে আপনি ক্ষুব্ধ হবেন কেন?

আফসোস আসতে পারে। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা দর্শন ক'রে মনস্তাপ হতে পারে। তবে তাতে নিজেকে ছাড়া সকলকে জাহান্নামী জেনে মনে অহংকার থাকবে না। নচেৎ মহানবী ﷺ বলেন, "কেউ যখন বলে, 'লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেল!' তখন সে তাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশী ধ্বংসোন্মুখ।" *(মুসলিম)*

আসলে ঐ শ্রেণীর কথা যে বলে, সে হয়তো নিজের ইল্‌ম ও আমল নিয়ে গর্বিত, তাই বলে।

অপরাপর মানুষকে তুচ্ছজ্ঞান ক'রে ঐ কথা বলে।

আর তার জন্যই সে সবার চেয়ে বেশি ধ্বংসোন্মুখ। যেহেতু সে অপরকে ছোট এবং নিজেকে সবার শ্রেষ্ঠ ভাবে, অপরের গীবত করে এবং তাতে তার অহংকার প্রকাশ পায়।

হাদীসের শেষাংশের দ্বিতীয় অর্থ এই যে, যে অপরকে ধ্বংসোন্মুখ বলে,

সেই আসলে অপরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। আসলে কিন্তু তারা ধ্বংসোন্মুখ নয়। যেহেতু তাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহর ইচ্ছা তার জানা নেই। কে ধ্বংস হবে, না হবে---সে নিশ্চয়তাও তার কাছে নেই।

সেই অপরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। কারণ সে অপরকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ ক'রে ফেলে। আর আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া কাফেরদের কাজ।

অবশ্য গর্ব না করে লোকেদের দ্বীনদারীর দুরবস্থা ও পাপাচরণ দেখে দুঃখ প্রকাশ ক'রে কেউ যদি ঐ কথা বলে, তাহলে তা দোষাবহ নয়। *(আবূ দাঊদ ৪৯৮৩নং)*

অবশ্যই মনে দুঃখ হবে, কষ্ট হবে, আফসোস হবে। কিন্তু তাতে সান্ত্বনা নেওয়া উচিত। আমাদের পথিকৃৎ মহানবী ﷺ-এর অনুসরণ ক'রে সবুর করা উচিত। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে অনেক কথা বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, কাকেও যদি তার মন্দ কাজ শোভন ক'রে দেখানো হয় এবং সে একে উত্তম মনে করে, সে ব্যক্তি কি তার সমান (যে সৎকাজ করে)? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তুমি ওদের জন্য আক্ষেপ ক'রে নিজেকে ধ্বংস করো না। নিশ্চয় ওরা যা করে, আল্লাহ তা খুব জানেন। *(ফাত্বির ঃ ৮)*

( ) { }

অর্থাৎ, তারা এই বাণী বিশ্বাস না করলে তাদের পিছনে পিছনে ঘুরে সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে আত্মবিনাশী হয়ে পড়বে। *(কাহফ ঃ ৬)*

( ) { }

অর্থাৎ, ওরা বিশ্বাস করে না বলে তুমি হয়তো মনঃকষ্টে আত্মঘাতী হয়ে পড়বে। *(শুআরা' ঃ ৩)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা তাদের অনেকের ধর্মদ্রোহিতা ও অবিশ্বাসই বৃদ্ধি করবে। সুতরাং তুমি অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখ করো না। *(মাইদাহ ঃ ৬৮)*

দুঃখ ও আফসোস ক'রে বলারও কিছু নেই।

কাফেরদেরকে হিদায়াত দেওয়া অথবা তাদের ব্যাপারে যে কোন প্রকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সব কিছুই আল্লাহর এখতিয়ারাধীন। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, উহুদ যুদ্ধে নবী করীম ﷺ-এর দাঁত শহীদ এবং মুখমণ্ডল আহত হলে তিনি বলেছিলেন, "এমন জাতি কীভাবে সফল হতে পারে, যারা তাদের নবীকে আহত করে।" তিনি যেন তাদের হিদায়াত থেকে নিরাশা প্রকাশ করেন। যার ফলে নিম্নের আয়াত অবতীর্ণ হয়। অনুরূপ অন্যান্য বর্ণনায় এসেছে যে, তিনি ﷺ কাফেরদের উপর বদ্দুআ করার জন্য কুনুতে নাযেলার যত্ন নিলে মহান আল্লাহ এই আয়াত অবতীর্ণ করেন।

( ) }

( ) {

অর্থাৎ, এ বিষয়ে তোমার করণীয় কিছুই নেই, তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। কারণ, তারা অত্যাচারী। আকাশমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, সমস্তই আল্লাহর। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(আলে ইমরান ঃ ১২৮-১২৯)*

অতঃপর তিনি ﷺ বদ্দুআ করা বাদ দেন। এই সেই গোত্র যাদের উপর রসূল ﷺ বদ্দুআ করেছিলেন, তারা সকলেই আল্লাহর তাওফীক্বে মুসলমান হয়ে যায়। অতএব এ কথা পরিষ্কার যে, সমস্ত ক্ষমতার মালিক এবং অদৃশ্য জগতের (গায়বী) জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ।

এই আয়াত থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা নবী করীম ﷺ-কে ইচ্ছাময় ক্ষমতার মালিক মনে করে। তাঁর তো এতটুকু এখতিয়ারও ছিল না যে, কাউকে সঠিক পথের পথিক ক'রে দেন। অথচ তিনি এই পথের দিকে আহবান করার জন্যই প্রেরিত হয়েছিলেন।

উপেক্ষায় দাঈর মন দুঃখিত হয়, দাওয়াতের কাজে মন পিছপা হতে চায়, সেই সময় প্রয়োজন পড়ে সমর্থনের, দরকার পড়ে সান্ত্বনার, জরুরী হয় অনুপ্রেরণার। মহান আল্লাহ ঠিক তাই দান করেছিলেন স্বীয় নবী ﷺ-কে।

}

( )

( )

( )

( ) {

অর্থাৎ, আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে, তা তোমাকে নিশ্চিতই কষ্ট দেয়। আসলে তারা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং অত্যাচারিগণ আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে। তোমার পূর্বেও অনেক রসূলকে অবশ্যই মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাদের নিকট আমার সাহায্য না আসা পর্যন্ত তারা ধৈর্য ধারণ করেছিল। আল্লাহর (প্রতিশ্রুত) বাক্যকে পরিবর্তন করার মত কেউ নেই। আর অবশ্যই প্রেরিত পুরুষগণের কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট এসেছে। যদি তাদের উপেক্ষা তোমার নিকট কষ্টকর হয়, তাহলে পারলে ভূগর্ভে কোন সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে কোন সোপান অন্বেষণ ক'রে তাদের নিকট কোন নিদর্শন আনয়ন কর। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের সকলকে অবশ্যই সৎপথে একত্র করতেন। সুতরাং তুমি অবশ্যই মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। যারা শ্রবণ করে, শুধু তারাই ডাকে সাড়া দেয়। আর মৃতদিগকে আল্লাহ পুনর্জীবিত করবেন, অতঃপর তাঁর দিকেই তারা প্রত্যানীত হবে। *(আনআম ঃ ৩৩-৩৬)*

( ) }

( ) { ( )

অর্থাৎ, আমি তো অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে তাতে তোমার হৃদয় সংকুচিত হয়। সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হও। আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। *(হিজর ঃ ৯৭-৯৯)*

}

( ) {

অর্থাৎ, হে রসূল! যারা মুখে বলে, 'বিশ্বাস করেছি' কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী

নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর, তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণে (ও অনুসরণে) অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি, ওরা তাদের জন্য (তোমার কথায়) কান পেতে (গোয়েন্দাগিরি ক'রে) থাকে। (তাওরাতের) বাক্যগুলিকে ওর স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা বলে, এ প্রকার (বিকৃত বিধান) দিলে গ্রহণ কর এবং এ (বিকৃত বিধান) না দিলে বর্জন কর। আর আল্লাহ যার পথচ্যুতি চান, তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করার নেই। ঐ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না। তাদের জন্য আছে ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি। *(মাইদাহ ঃ ৪১)*

( ) { }

অর্থাৎ, ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় শক্তি-সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। *(ইউনুস ঃ ৬৫)*

}

( ) {

অর্থাৎ, তুমি ধৈর্যধারণ কর; আর তোমার ধৈর্য তো হবে আল্লাহরই সাহায্যে। তাদের (অবিশ্বাসের) জন্য তুমি দুঃখ করো না এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। *(নাহল ঃ ১২৭)*

এ সকল সান্ত্বনা নিয়ে দাঈকে দাওয়াতের বন্ধুর পথে অগ্রসর হতে হয়, উপেক্ষা করতে হয় শত সমালোচনাকে, উল্লংঘন করতে হয় শত বাধা-বিঘ্নকে, তবেই তিনি আল্লাহর ইচ্ছায় কৃতকার্য হন।

আর সে দাঈ কত বড় সৌভাগ্যবান, যিনি নানা শোকে-দুঃখে, বাধা ও বিপদে নিজ পাশে সান্ত্বনা দান করার মতো মা খাদীজা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র আদর্শের স্ত্রী পান। শুধু দ্বীনের দাঈই নয়, প্রত্যেক পুরুষের জন্য এমন স্ত্রী মহান স্রষ্টার সবচেয়ে বড় দান।

দাওয়াতের উদ্দেশ্য

প্রত্যেক কাজের উদ্দেশ্য থাকে। দাঈর দাওয়াতী কাজের পশ্চাতেও বহু মহান উদ্দেশ্য থাকে। আর তা নিম্নরূপ ঃ-

১। আল্লাহর দিকে আহবানের দায়িত্ব ও আমানত পালন।

আল্লাহ যাকে হিদায়াত করেছেন, তার ঘাড়ে এ আমানতও চাপিয়ে দিয়েছেন যে, সে যেন অপরকে হিদায়াত করে। সুতরাং এই আমানত পালন করা দাওয়াতের একটি মহান উদ্দেশ্য।

মহান আল্লাহ তাঁর রসূলকে এবং সেই সূত্রে আমাদেরকেও বলেছেন,

}

[:]{

অর্থাৎ, হে রসূল! তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তা প্রচার কর। যদি তা না কর, তবে তো তুমি তাঁর বার্তা প্রচার করলে না। *(মাইদাহঃ ৬৭)*

{ }

অর্থাৎ, ওরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, (হে মুহাম্মাদ!) তাহলে তোমাকে তো আমি ওদের রক্ষক ক'রে পাঠাইনি। তোমার কাজ তো কেবল প্রচার ক'রে যাওয়া। *(শূরাঃ ৪৮)*

[:]{ }

অর্থাৎ, রসূলদের কর্তব্য সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা ছাড়া আর কী? *(নাহলঃ ৩৫)*

. [:]{ }

অর্থাৎ, অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছ, তা প্রকাশ্যে প্রচার কর এবং অংশীবাদীদেরকে উপেক্ষা কর। *(হিজ্‌রঃ ৯৪)*

আর যাঁরা তাঁর রিসালাতের তাবলীগের আমানত পালন করেন, তাঁদের সম্বন্ধে বলেছেন,

{ }

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর বাণী প্রচার করত; ওরা তাঁকে ভয় করত এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাকেও ভয় করত না। আর হিসাব গ্রহণে আল্লাহই যথেষ্ট। *(আহযাবঃ ৩৯)*

২। আল্লাহর কাছে দাঈর দোষমুক্তি লাভ করা।

দাওয়াত কবুল না হলেও দাঈ নিজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলেছিল, 'আল্লাহ যাদেরকে ধ্বংস করবেন কিংবা কঠোর শাস্তি দেবেন, তোমরা তাদেরকে সদুপদেশ দাও কেন?' তারা বলেছিল, 'তোমাদের প্রতিপালকের নিকট দোষ মুক্তির জন্য এবং যাতে তারা সাবধান হয় এ জন্য।' *(আ'রাফঃ ১৬৫)*

৩। মানুষের উপর আল্লাহর হুজ্জত কায়েম করা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, আমি সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রসূল প্রেরণ করেছি; যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। *(নিসাঃ ১৬৫)*

মহান আল্লাহ নবুঅত অথবা সুসংবাদ দান ও ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে এই জন্যেই অব্যাহত রেখেছেন, যাতে শেষ বিচারের দিনে কেউ এ ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমাদের নিকট তোমার কোন বার্তা পৌঁছেনি। যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন,

}

{

অর্থাৎ, যদি আমি ওদেরকে তার পূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে ওরা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শন মেনে নিতাম। *(সূরা ত্বা-হা ১৩৪ আয়াত)*

৪। সওয়াবের আশা।

দাওয়াতের কাজে যে বিশাল সওয়াব রয়েছে, সে সওয়াব অর্জন করাও দাঈর উদ্দেশ্য। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ যদি একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তাহলে তা তোমার জন্য লাল উটনী (আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ) অপেক্ষা উত্তম।" *(বুখারী ৩৭০১, মুসলিম ২৪০৬নং)*

৫। কিতাব ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের তরবিয়ত। মানুষকে হিদায়াতের দিকে আহবান করা। সঠিক আক্বীদাহ ও আমলের দিকে ডাক দেওয়া। অমুসলিমকে ইসলামের দিকে, ভ্রষ্ট মুসলিমকে সঠিক ইসলামের দিকে, পাপাচারের অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোর দিকে, সৃষ্টির দাসত্ব করা থেকে স্রষ্টার দাসত্ব করার দিকে আহবান করা। মহান আল্লাহ বলেন,

[:]{ }

অর্থাৎ, আমি তো তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি শুধু করুণা রূপেই প্রেরণ করেছি। *(আম্বিয়াঃ ১০৭)*

}

[:]{

অর্থাৎ, আলিফ লা-ম রা। এই কিতাব এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি; যাতে তুমি মানব জাতিকে তাদের প্রতিপালকের নির্দেশক্রমে অন্ধকার হতে আলোকের দিকে; পরাক্রমশালী, সর্বপ্রশংসিতের পথে বের করে আনতে পার। *(ইব্রাহীম ঃ ১)*

[:]{ }

অর্থাৎ, আর যাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি, তাদের মধ্যে একদল লোক আছে যারা (অন্যকে) ন্যায় পথ দেখায় এবং ন্যায় বিচার করে। *(আ’রাফ ঃ ১৮১)*

মহানবী ﷺ বলেন, “দ্বীন হল হিতাকাঙ্ক্ষার নাম।” (সাহাবী বলেন,) আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, ‘কার জন্য হে আল্লাহর রসূল!’ তিনি বললেন, “আল্লাহ, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, মুসলিমদের নেতৃবর্গ এবং তাদের জনসাধারণের জন্য।” *(মুসলিম ৫৫নং)*

৬। আল্লাহর কালেমা ও দ্বীনকে বিজয়ী ও উচ্চ করা।

}

[:]{

অর্থাৎ, তিনিই পথনির্দেশ (কুরআন) এবং সত্য ধর্ম সহ নিজ রসূল প্রেরণ করেছেন, যাতে তাকে সকল ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও অংশীবাদীরা অপ্রীতিকর মনে করে। *(তাওবাহ ঃ ৩৩)*

৭। দ্বিধাবিভক্ত মুসলিম সমাজে ঐক্য-প্রতিষ্ঠা করা। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহভিত্তিক তাওহীদের ছায়াতলে মুসলিম উম্মাহকে একতাবদ্ধ করা। আর তারই মাধ্যমে মুসলিমদের শক্তি ও হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রশি (ধর্ম বা কুরআন)কে শক্ত ক’রে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। *(আলে ইমরান ঃ ১০৩)*

ইসলাম কেবল নামায-রোযা ইত্যাদি ইসলামের আরকানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যেমন কেবল ইসলামী রাষ্ট্র-রচনা করাই প্রধান উদ্দেশ্য নয়। অতএব দাঈর দাওয়াত যেন কেবল তাতেই সীমাবদ্ধ না থাকে। ইসলাম পরিপূর্ণ একটি জীবন-ব্যবস্থার নাম। সুতরাং দাওয়াতও মুসলিম-জীবনের

সর্বদিক শামিল হওয়া বাঞ্ছনীয়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দাওয়াত আগে হওয়া আবশ্যক। সুতরাং আক্বীদা ছেড়ে আহকাম, ফারায়েয ছেড়ে ফাযায়েল, ব্যক্তি জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ছেড়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাওয়াত বিফল। যেহেতু যে ইমারতের বুনিয়াদ মজবুত নয়, তা তো ভেঙ্গে পড়ারই কথা।

দাওয়াতের পদ্ধতি

দাওয়াতের কাজে আমাদের পথিকৃৎ ও আদর্শ হলেন মহানবী ﷺ।

}

( ) {

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর (চরিত্রের) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে। *(আহযাব ঃ ২১)*

পরবর্তী কোন ইমাম, বুযুর্গ বা নেতা আমাদের আদর্শ নয়। অতএব আমাদের দাওয়াত রাজনীতি বা ফাযায়েল দিয়ে শুরু নয়। বরং তওহীদ দিয়ে।

তিনি মক্কায় রাজা হননি। তিনি মুআয ؓ-কে ইয়ামান পাঠাবার সময় বলেছিলেন, “তাদের (ইয়ামানবাসীদেরকে সর্বপ্রথম) এই সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আহবান জানাবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই, আর আমি আল্লাহর রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, আল্লাহ তাদের উপর রাতদিনে পাঁচ অক্তের নামায ফরয করেছেন। অতঃপর যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন; যা তাদের মধ্যে যারা (নিসাব পরিমাণ) মালের অধিকারী তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের দরিদ্র ও অভাবী মানুষদের মাঝে তা বন্টন ক’রে দেওয়া হবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

‘হিকমত’ পরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে যে, দাওয়াতের কাজে পর্যায়ক্রম জরুরী। একটি লোকের যদি তিনটি রোগ হয়, পায়খানা, ফোঁড়া, সর্পদংশন, তাহলে ডাক্তারের মত রোগ নির্ণয় ক’রে সর্বপ্রথম সবচেয়ে মারাত্মক রোগটির চিকিৎসা আগে করতে হবে।

সঠিক দাওয়াতের বৈশিষ্ট্য হল, তাওহীদ প্রতিষ্ঠা, ঐক্য প্রতিষ্ঠা, অতিরঞ্জন ও ঢিলেমির মধ্যবর্তীপন্থা অবলম্বন করা।

দাওয়াতে দাঈ সরাসরি কোন ব্যক্তি বা জামাআতকে হামলা করবে না।

আপত্তি, প্রতিবাদ বা খণ্ডন আক্রমণাত্মক বা নিছক সমালোচনামূলক নয়, খণ্ডন করতে হবে হিকমতের সাথে গঠনমূলকভাবে।

দাওয়াতের কাজে দিন নির্দিষ্ট করা অথবা দিনের নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারণ করা সুন্নাহসম্মত নয়।

“যে ব্যাপারে আমরা একমত, সে ব্যাপারে মিলেমিশে কাজ করব এবং যে বিষয়ে ভিন্নমত, সে বিষয়ে একে অপরকে উদারতা প্রদর্শন করব”---এই মতবাদ রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে চলতে পারে অথবা ফারয়ী (গৌণ, জুযঈ বা ইজতিহাদী) মাসায়েলের ব্যাপারে চলতে পারে। এ মতবাদ আক্বীদার ব্যাপারে চলতে পারে না। নচেৎ এই নীতি অনুযায়ী শিয়া, মাযারী, কাদিয়ানী প্রভৃতি বহু বিদআতী দলের সাথে আপোস ক'রে কাজ করা যাবে। অথচ এমন আপোস ঈমানের খাতিরে বৈধ নয়। যেহেতু তাতে শির্ক ও কুফরীতে মৌন সমর্থন প্রকাশ পাবে। আর তা নিশ্চয়ই অভীষ্ট নয়।

“কাজ ক'রে যাও, মতভেদ উত্থাপন করো না”---কথাটিও অনুরূপ। আক্বীদার ব্যাপারে এ কথা অচল।

যা আল্লাহর দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা যে দ্বীনে শামিল করে, সে আল্লাহর দুশমন। তার সাথে আপোস করা, তার সাথে অন্তরঙ্গতার সম্প্রীতি বজায় রাখা অথবা তার সাথে তোষামোদ ক'রে চলা আসলে আল্লাহর সাথে দুশমনি করার শামিল। সুতরাং এ কাজ আহলে সুন্নাহ বা আহলে হাদীসের হতে পারে না।

কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ বুঝব ও বুঝাবো সলফে সালেহীনের বুঝ অনুসারে। নচেৎ অন্য কারো বুঝ অনুসারে বুঝলে তো ‘সকল ফির্কাই হকপন্থী’ বলে মেনে নিতে হবে। সকল বিদআতী ফির্কাই বলে, ‘আমরাই হকপন্থী। আমাদের কাছে দলীল আছে।’

আমরা কোন বিষয়ে অতিরঞ্জন করব না। *(অতিরঞ্জন দ্রঃ)*

দাঈর জন্য অন্ধভাবে কোন ব্যক্তি, জামাআত বা দেশের অনুকরণ করা বৈধ নয়। তাঁর প্রতীক হবে ‘হক গ্রহণ, বাতিল বর্জন’ চাহে তা যেখানেই থাক। আরবী কবি বলেছেন,

....

অর্থাৎ, আমি গাযিয়্যাহ গোত্রের লোক। গাযিয়্যাহ ভ্রষ্ট হলে আমি ভ্রষ্ট। আর সে পথপ্রাপ্ত হলে আমিও পথপ্রাপ্ত!

এই শ্রেণীর অন্ধানুকরণ জাহেলী যুগের মানুষদের কাজ। ‘অমুক কি জানেন না বা জানতেন না? অমুক জাহান্নামে গেলে আমিও যাব!’ এ হল মূর্খদের কথা। কারণ, ‘অমুক’-এর ওযর বা অজুহাত থাকতে পারে, কিন্তু

আপনার ওযর বা অজুহাত কী?

ইসলামী দাওয়াতে কোন নামের লেভেল, দেশীয় বা জাতীয় কোন লেভেল হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ এ দাওয়াত হল আন্তর্জাতিক। আরব-আজম সকলের জন্য এ দাওয়াত। আর প্রকৃত ইসলাম হল কিতাব, সহীহ সুন্নাহ ও সলফদের ইসলাম। বাকী তো ভ্রষ্টতা। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস! *(নিসাঃ ১১৫)*

ইসলামের স্বর্ণযুগে কোন সংগঠন ছিল না। অবশ্য তখন ছিল ইসলামী শাসন, ইসলামী রাজ্য। তবুও দাওয়াতী কাজের জন্য সংগঠন-মালার কোন মুক্তা হওয়া জরুরী নয়। সাংগঠনিক নিয়মতান্ত্রিক সংকীর্ণতায় আবদ্ধ হওয়ার চাইতে মুক্ত ও স্বাধীন থেকে দাওয়াতের কাজ বেশি সুবিধা। অবশ্য উলামাদের মাঝে পারস্পরিক ঐক্য বজায় রাখা অবশ্যই জরুরী। নচেৎ যে যেমন পারল, ফতোয়া দিয়ে বেড়াল, তা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয় নয়।

কারো উক্তির খণ্ডন বা প্রতিবাদ করার সময় কেবল সেই ব্যক্তির ত্রুটি উল্লেখ করব, যার দ্বারা তা ঘটেছে। তার জের ধরে তার বংশ, দেশ বা জামাআতের নিন্দা করব না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “অপবাদের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় (নিকৃষ্ট) লোক সেই ব্যক্তি, যে ব্যঙ্গ-কবিতা দ্বারা কোন ব্যক্তির নিন্দা করতে গিয়ে গোটা গোত্রের নিন্দা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতাকে অস্বীকার ক'রে মা-কে ব্যভিচারিণী বানায়।” *(ইবনে মাজাহ)*

অপরের সমালোচনা করার আগে খেয়াল রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে আহবান করে, তাদেরকে তোমরা গালি দেবে না। কেননা, তারা বৈরীভাবে অজ্ঞানতাবশতঃ আল্লাহকেও গালি দেবে। *(আনআমঃ ১০৮)*

স্মরণ রাখতে হবে এ হাদীসও, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “কাবীরাহ গুনাহসমূহের একটি হল আপন পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া (ও অভিশাপ

করা)। জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর রসূল! আপন পিতা-মাতাকে কি কোন ব্যক্তি গালি দেয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ, সে লোকের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে। এবং সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, সুতরাং সেও তার মা-কে গালি দেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

নিজের আত্মীয়-স্বজন দিয়ে শুরু করতে হবে

দাওয়াতের কাজ শুরু হবে নিজের বাড়ি থেকে, নিজের পরিমন্ডল থেকে, নিজের গ্রাম ও শহর থেকে। মহান আল্লাহ স্বীয় নবী ﷺ-কে বলেছিলেন,

( ) { }

অর্থাৎ, তোমার নিকটতম স্বজনবর্গকে তুমি সতর্ক ক'রে দাও। *(শুআরা' ২১৪)*

দুনিয়ার নীতি এটাই,

'আগে সামাল আপন ঘর,
তার পরে তুই পরকে ধর।'

আর ঘরের লোক, গোত্রের লোক, গ্রামের লোক, শহরের লোক দোসর হলে কাজে মনোযোগ বাড়ে, সাহস বৃদ্ধি পায়। যেহেতু দাঁড়াবার জন্য পায়ের তলায় মাটি পাওয়া যায়।

কিন্তু ঘরের লোক যদি না মানে, ঘরের কনে যদি পোঁটা-লাগা হয়, ঘর কা মুরগা যদি দাল বরাবর হয়, তাহলে কি পরকে উপদেশ দেওয়া যাবে না? তা অবশ্যই নয়। তবে দাঈর যেমন নিজেকে শুধরানো আগে দরকার, তেমনি উচিত হল নিজের বাড়িকে শুধরানো। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে যাকে সম্ভব, তাকেই শুধরানো তার কর্তব্য।

নূহ ﷺ-এর স্ত্রী ও তাঁর এক ছেলের মন সংস্কার পায়নি, তবুও তিনি পরকে বলতে ছাড়েননি।

লূত ﷺ-এর স্ত্রী হিদায়াতের ছোঁয়া পাননি, তবুও তিনি দাওয়াতের কাজ বন্ধ করেননি।

ইব্রাহীম ﷺ-এর আব্বা হিদায়াতের আলো পাননি। তা বলে তিনি অপরকে দাওয়াত দেওয়া বন্ধ করেননি।

শেষনবী ﷺ-এর কয়েকটি চাচা তাঁর হিদায়াতের পরশ পাননি। তবুও তিনি ঘর-পরকে দাওয়াত দেওয়া বর্জন করেননি।

মর্যাদাবানের মর্যাদা রক্ষা ক'রে গোপনে দাওয়াত দেওয়া

কিছু মর্যাদাবান মানুষ আছেন, যাঁদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে জালসা, খুতবা, মহফিল, ইজতিমা প্রভৃতি লোকারণ্যে লাঞ্ছিত করা বৈধ নয়। তাছাড়া তাতে তাঁদের দাওয়াত ও হক গ্রহণের আশা কম থাকে। বরং ফিতনার আশঙ্কাই বেশী থাকে। রাষ্ট্রনেতা বা রাজা ও অনুরূপ উচ্চ পর্যায়ের মানুষের ক্ষেত্রে গোপনে নসীহত প্রয়োগ করা দরকার। তা না ক'রে সভায় সভায় তাঁদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের মন ভাঙ্গানো অথবা তাদেরকে উত্তেজিত ক'রে ফিতনা সৃষ্টি করা বৈধ নয়।

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি রাজকর্তৃপক্ষকে হিতোপদেশ দান করার ইচ্ছা করে, সে যেন প্রকাশ্যে তা না করে; বরং তার হাত ধরে নির্জনে (উপদেশ দান করে)। সে যদি তার নিকট হতে (ঐ উপদেশ) গ্রহণ করে নেয় তো উত্তম। নচেৎ নিজের দায়িত্ব সে যথার্থরূপে পালন ক'রে থাকে।" *(সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে যে বক্তা রাজনৈতিক গরম গরম বক্তৃতা করবেন, তিনিই বড় প্রসিদ্ধ হবেন। যেহেতু রাজনৈতিক বিষয়টি বড় উষ্ণ এবং অধিকাংশ মানুষ তাতে তৃপ্তি পেয়ে থাকে। তাই মজলিসও গরম হয় ভাল। অথচ শরীয়তে এই শ্রেণীর উস্কানিমূলক বক্তৃতা অনুমোদিত নয়।

আপনি হয়তো বলতে পারেন, নবী ﷺ বলেছেন, "অত্যাচারী বাদশাহর নিকট হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)* এটা কি সহীহ হাদীস নয়?

আমি বলব, অবশ্যই। কিন্তু সেটা হবে তার সামনে গোপনে, তার কাছে। তার পিছনে সাধারণ মানুষের সামনে নয়।

বহু উদ্ধত মানুষ আছে, যাদেরকে জনসমক্ষে অথবা নির্জনে উপদেশ দিলে অপমান বোধ করে। মহান আল্লাহ সে কথা বলেছেন,

{ }

অর্থাৎ, যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। *(বাক্বারাহ ঃ ২০৬)*

সুতরাং কাছে গিয়ে তাদেরকে গোপনে উপদেশ দেওয়া অথবা দূর থেকে দূরালাপে অথবা চিঠি লিখে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন,

....

....

....

অর্থাৎ, আমাকে তখন তোমার উপদেশ দিয়ো, যখন আমি একাকী থাকব। লোকালয়ে উপদেশ দেওয়া থেকে আমাকে দূরে রেখো।

যেহেতু মানুষের কাছে উপদেশ হল এক শ্রেণীর তিরস্কার, যা আমি শুনতে রাজি নই।

আর যদি তুমি আমার বিরুদ্ধাচরণ কর এবং আমার কথাকে অমান্য কর, তাহলে তোমার আনুগত্য না করা হলে ধৈর্যচ্যুত হয়ো না।

নামাযের মধ্যে এক ব্যক্তির মোবাইলে মিউজিক বাজছিল। সালাম ফেরার পর যদি সরাসরি তাকে সে ব্যাপারে বলে আপত্তি জানানো হয়, তাহলে সে লজ্জা পাবে, তার মনে আঘাত পাবে। যেহেতু জামাআতের মাঝে সে অপমানিত হচ্ছে। পক্ষান্তরে নির্জনে তাকে একাকী নসীহত করলে মিউজিকের বদলে সাধারণ রিং ফিট করতে পারে। আর জামাআতে অন্যের শিক্ষার জন্য বলতে হলে আমভাবে বলতে হবে।

অতিরঞ্জন

ইসলাম একটি মধ্যপন্থার ধর্ম। এতে কোন বিষয়ে না বাড়াবাড়ি আছে, না অবজ্ঞা-অবহেলা আছে। উম্মতে মুহাম্মাদী কট্টরপন্থী নয়, নরমপন্থী নয়, চরমপন্থীও নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, এভাবে আমি তোমাদেরকে এক মধ্যপন্থী জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষীস্বরূপ হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষীস্বরূপ হবে। *(বাক্বারাহঃ ১৪৩)*

অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞার ফলে নানা বিদআত সৃষ্টি হয়। কট্টরপন্থা অবলম্বনের ফলে ইসলামের আসল রূপ বিকৃত হয়।

এখানে একটি উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “তোমরা শিশুকে সাত বছর বয়সে নামায শিক্ষা (ও আদেশ) দাও এবং দশ বছর বয়সে তার জন্য তাকে মার।” *(আবূ দাউদ, তিরমিযী)*

এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে তিন শ্রেণীর মানুষ নজরে পড়বে।

এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা তাদের ছেলের বয়স সাত-আট বছর হলে এবং নামাযের আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও নামায না পড়লে, তাকে মারধর করে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের ছেলেদের বয়স পনেরো হলেও নামাযের আদেশ করে না।

আর তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ যথা সময়ে আদেশ করে, যথা সময়ে প্রয়োজনে মারধর করে।

দাঈকে এ নীতি বুঝে দাওয়াতের কাজ করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেক বিষয়কে তার যথার্থ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করতে হবে।

কোন মানুষকে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ করা দাঈর কাজ নয়। যেমন কোন মানুষকে আল্লাহর আযাব থেকে নিরাপদ করাও তার কাজ নয়।

ফরযকে সুন্নত ও সুন্নতকে ফরযের দর্জা দেওয়া কোন দাঈর কাজ হতে পারে না। যে বিষয়ে অনুমতি আছে, সে বিষয়ে কঠোরতা অবলম্বন করা হতে পারে না। আর বিদআতকে সুন্নত বানানো তো হতেই পারে না।

নবীর তরীকায় নামায না পড়লে, নামায বাতিল। অতএব রফ্য়ে য়্যাদাইন না করলে নামায হবে না।

রোযায় থুথু গেলা যাবে না, গোসল করা যাবে না।

দাড়ি না রাখলে নামায-রোযা কিচ্ছু কবুল হবে না।

মোছের পানি হারাম।

মাথায় টুপি ছাড়া আযান-ইক্বামাত-নামায হবে না।

চুল ছোট রাখা ওয়াজেব।

শাড়ি বেশ্যাদের পোশাক।

পর্দা-বিবির বাস-ট্রেন চাপা চলে না।

অমুক অমুক পার্টিকে ভোট দেয়, সে কাফের। ইত্যাদি।

কত শত কড়া ফতোয়ার চড়া মেজাজের দাঈ দাওয়াতের কাজ ক’রে মানুষের মাঝে বিভ্রান্তি ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করছে। কিন্তু দাঈর মধ্যে এমন অতিরঞ্জন থাকা উচিত নয়।

কাবীরা গোনাহর পাপীকে চোখ বন্ধ ক’রে কাফের বলার প্রবণতা দাঈর থাকতে পারে না।

কোন ব্যক্তি বা জামাআতকে সরাসরি কাফের বলার আলগা জিভ দাঈর হতে পারে না।

কোন রাজনৈতিক পার্টির নেতা বা সমর্থককে চোখের পলকে কাফের ফতোয়া দেওয়ার প্রবণতা কোন দ্বীনের দাঈর হতে পারে না।

এ সকল কাজ তো অজ্ঞদের অথবা মুফতী সাহেবদের।

দাঈ পারে না কুরআন-হাদীসের কোন ঘটনার উপর কবি-ঔপন্যাসিকদের মতো কল্পনার রঙ চড়াতে। যেমন, 'হাদীসে আছে, আমার নবী সাংসারিক কাজে স্ত্রীর সহযোগিতা করতেন। বাটনা বেঁটে দিতেন, কোটনা কুঁটে দিতেন, থালা-বাটি মেজে দিতেন.......!!!'

কারণ, অত্যুক্তি ও অতিকথনের ফলে দাঈর কথার ওজন কমে যায়। আর সে কথা শুনে অজ্ঞ মানুষরা খুশ হলেও বিজ্ঞদের কাছে ছোট হতে হয়। কুরআন-হাদীসের কথা মাপা কথা, তা মেপে বলাই জরুরী। নচেৎ লাগাম ছেড়ে কথা বললে, জিভের ঘোড়া এমন পথে নিয়ে যাবে, যে পথ বড় বিপজ্জনক।

দাওয়াতের নানা মাধ্যম

দাওয়াতের বিভিন্ন অসীলা ও উপায় প্রয়োজনমত ব্যবহার করা দ্বীনের দাঈর কর্তব্য। সাধ্যমত রেডিও, টিভি ও ইন্টারনেটে স্থান ক'রে নেওয়া বর্তমান বিশ্বের দাওয়াতের একটি অনন্য উপায়। ভিডিও, অডিও ও সিডির মাধ্যমে সঠিক দ্বীন প্রচার করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে বৈয়াক্তিক অথবা সাংগঠনিক প্রয়াসে। যে বৈধ উপায়ে মানব-মনের গভীরে পৌঁছনো যায়, সেই উপায় অবলম্বন করতে হবে দ্বীনের দাঈকে। বলাই বাহুল্য যে, কোন সৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করা বৈধ নয়।

❁ বক্তৃতা

মহানবী ﷺ বিভিন্ন উপলক্ষে ভাষণ দান করতেন। আর তারই মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের তা'লীম দিতেন। দ্বীনের দাঈও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে নিজের দিকে নয়, বরং আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহবান করবে। নিশ্চয় কিছু বয়ানের মাঝে জাদু আছে। যে বয়ানে মানুষ মুগ্ধ হয়ে আল্লাহর পথে ফিরে আসে।

দাঈ যখন কোন কথা হৃদয় থেকে বলবে, তখন সে কথা হৃদয়ে গিয়ে স্থানলাভ করবে। আর যে কথা মুখ থেকে বলবে, সে কথা এক কান দিয়ে প্রবেশ ক'রে অন্য কান দিয়ে বের হয়ে যাবে।

❁ ওয়ায

প্রয়োজনে দ্বীনের দাঈ মানুষের হিদায়াতের জন্য ওয়ায করবে। তাতে ইতিহাস ও বৈধ কেচ্ছা-কাহিনীও বলা বৈধ। তবে যয়ীফ ও জাল হাদীস বর্ণনা ক'রে ওয়ায করা বৈধ নয়। বৈধ নয় নিজের পক্ষ থেকে কুরআনের ব্যাখ্যা করা। বৈধ নয় বিনা ইলমে ওয়ায-ভাণ্ডার বিতরণ করা। জায়েয নয়

আক্বীদা-বিরোধী আজগুবি গল্প বয়ান করা।

আম জলসা ও ওয়ায-মহফিলে দ্বীনের দাঈ মানুষকে ইসলামের দিকে আহবান করবে। দ্বীন জেনে তা পালন করার উপর সকলকে উদ্বুদ্ধ করবে।

তবে এর জন্য বিদআতী মহফিল বা অনুষ্ঠান করা বৈধ নয়। বৈধ নয় কারো জন্ম বা মৃত্যু-বার্ষিকীর সুযোগ নিয়ে ওয়ায করা। কারো মীলাদ বা অফাতের দিনে অনুষ্ঠান ক'রে লোককে ওয়ায করা। বৈধ নয় লোক জমাবার উদ্দেশ্যে গান-বাজনা বা অবৈধ খেলাধূলার ব্যবস্থা করা অথবা বিদআতী কোন আচরণ প্রদর্শন করা।

❁ খুতবাহ

প্রত্যেক সপ্তাহে মুসলিমদের ঈদের দিন শুক্রবার। এ দিনে জুমআর নামাযের পূর্বে খুতবাকে ব্যবহার করতে হবে সঠিক পদ্ধতিতে। জুমআর দিনে মসজিদে এমন অনেক লোক আসে, যারা পাঁচ-অক্তের জামাআতে আসে না।

যথারীতি প্রস্তুতি নিয়ে উপদেশ দিতে হবে সমাজকে। বর্তমান পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রতি খেয়াল রেখে প্রস্তুত করতে হবে সংক্ষিপ্ত খুতবাহ। মহানবী ﷺ প্রত্যেক জুমআর উভয় খুতবাতেই মানুষকে উপদেশ দিতেন। আল্লাহ ও তাঁর আযাবের ভীতি প্রদর্শন করতেন, পাপাচার ও অবাধ্যাচরণ বর্জন করতে আদেশ ও উৎসাহিত করতেন।

দুই ঈদের খুতবাতেও বহু এমন লোক এসে উপস্থিত হয়, যারা জুমআর খুতবাতে হাযির হয় না। সুতরাং খতীবের খুতবার লক্ষ্য সেই শ্রেণীর মানুষ হওয়াও উচিত।

❁ দর্স-হালকা

মসজিদ মুসলিমদের শিক্ষা-নিকেতন। এখানে প্রত্যহ পাঁচবার একত্রে উপস্থিত হতে হয় জামাআতের সকল মুসলিমকে। সেই সুযোগ গ্রহণ ক'রে দাঈ কোন এক নামাযের পর দর্সের সিলসিলা (ধারাবাহিক শিক্ষা)র ব্যবস্থা রাখতে পারে। কুরআন মাজীদের তফসীর, হাদীস গ্রন্থ অথবা অন্য কোন মাসায়েল গ্রন্থ নিয়ে নিয়মিত দর্স চালাতে পারে।

❁ আলোচনা-পর্যালোচনা

কোন মজলিসে দুই বা ততোধিক দাঈ সমবেত হয়ে দ্বীনের কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা চালাতে পারে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বহু সমস্যার সমাধান জানতে পারে সাধারণ মানুষ। এমনকি যে প্রশ্ন মানুষ করতে লজ্জা ও সংকোচবোধ করে এবং যে প্রশ্ন তার মনেও উদয় হয় না, সেই প্রশ্নের উত্তর সে অনুরূপ আলোচনায় পেয়ে যাবে।

❁ পেনার

কোন খাস বিষয়ে পেনার লিখে আম জনতার মাঝে আম চিঠির মতো দাওয়াতের কাজ করা যায়।

❁ পাম্পলেট, লিফলেট

ছোট কাগজে ছেপে বিশেষ কোন দ্বীনী বিষয় প্রচার করা যায়। সাময়িকভাবে মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে দেওয়া যায়।

❁ চিঠি

চিঠি লিখে খাস খাস নাম-ঠিকানায় পোস্ট ক'রেও দাওয়াতের কাজ করা সম্ভব। মহানবী ﷺ চিঠি পাঠিয়ে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য লেখার যাবতীয় পদ্ধতি চিঠি পাঠিয়ে দাওয়াত দেওয়ার মতোই।

❁ পঞ্জিকা

বাৎসরিক পঞ্জিকা প্রকাশ ক'রে তারই সাথে উপদেশমালা ছেপে দাওয়াতের কাজ নেওয়া যায়। যে মাসে যে বিষয়ে সতর্ক করা প্রয়োজন, সেই মাসের পাতায় সেই সতর্কবাণী দৃষ্টি-আকর্ষীরূপে মুদ্রিত হতে হবে। যাতে তারীখ দেখতে গিয়ে তা অতি সহজে নজরে পড়ে।

❁ কাঁচের বাঁধানো উপদেশমালা

সুন্দর সিন-সিনারিসহ কাঁচের বাঁধানো উপদেশমালা রুমে টাঙ্গিয়ে রেখে দাওয়াতের কাজ নেওয়া যায়। এতে কক্ষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের মনের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পাবে।

❁ কবিতা, গজল

কবিতা ও গজল লিখে ইসলামী দাওয়াত পেশ করা যায়। যেমন তা আবৃত্তি করাও দোষাবহ নয়।

❁ ক্যাসেট, সিডি

অডিও ক্যাসেট, ভিডিও ক্যাসেট, সিডি প্রভৃতি আধুনিক পদ্ধতিতে বক্তৃতা ও তথ্যচিত্র ইত্যাদি রেকর্ড ক'রে তা অভীষ্ট দাওয়াতী কাজে ব্যবহার করা যায়। বর্তমানে প্রায় ঘরে ঘরে টেপ, টিভি, ভিসিপি, সিডি প্লেয়ার ও কম্পিউটার আছে। অধিকাংশ মানুষ তা অসৎ কাজে ব্যবহার করে। সুতরাং তা সৎ কাজে ব্যবহার করার সুযোগ সৃষ্টি ক'রে তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

❁ ইন্টারনেট

ইন্টারনেটও আজ সারা বিশ্বের ঘরে ঘরে জাল বিছানোর মতো বিছানো আছে। এ জালকে দ্বীনের দাওয়াতের কাজে ব্যবহার করা এক প্রকার অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

সরাসরি সেই ব্যক্তির সাথেও উক্তরূপ আলোচনা করা যেতে পারে, যে ব্যক্তিকে দাওয়াত দেওয়া উদ্দিষ্ট।

❁ তর্কালোচনা

যদি কোন দাঈর সাথে কোন বিষয়ে মতভেদ থাকে, তাহলে উভয়ে সামনা-সামনি বসে শরয়ী আদবের সাথে তর্কালোচনা করতে পারে।

সে আলোচনা হবে সহীহ দলীলভিত্তিক।

পরস্পরকে শ্রদ্ধা করতে হবে।

কথার মধ্যে কোন প্রকার খোঁচা বা খোঁটা থাকা চলবে না। কেউ কাউকে ব্যক্তিগত আঘাত দিয়ে কথা বলবে না।

চরম উত্তেজিত হয়ে গরম কথা অথবা মেজাজ দেখিয়ে কোন কথা বলা যাবে না।

মহান আল্লাহ বিধর্মীদের সাথেও তর্কালোচনায় সুন্দর পন্থা অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

( ) { }

অর্থাৎ, সৌজন্যের সাথে ছাড়া তোমরা গ্রন্থধারী (ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান)দের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করো না; তবে ওদের মধ্যে যারা সীমালংঘনকারী, তাদের সাথে (তর্ক) নয়। *(আনকাবূত ঃ ৪৬)*

❁ বই-পুস্তক

এটি দাওয়াতের দীর্ঘস্থায়ী অসীলা। সুতরাং বই লিখে, ছেপে অথবা ক্রয় ক'রে বিতরণ করাও বড় ফলপ্রসূ দাওয়াত। দাঈ যা বলে, তা চলে যায়, কিন্তু যা লিখে, তা থেকে যায়। একাধিক ব্যক্তি একাধিক বার তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে। যুগযুগ ধরে তা পুনর্মুদ্রিত হয়েও পরবর্তী কয়েক পুরুষকে হিদায়াতের আলো দেখাতে পারে।

❁ পত্র-পত্রিকা

দাওয়াতের উদ্দেশ্যে পত্র-পত্রিকাও বড় সুফলদায়ক অসীলা। এতে প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক বা মাসিক সমস্যাবলী উপস্থাপিত ক'রে সমাধানের পথ বলে দেওয়া যায়।

বলা বাহুল্য, বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কলমের জিহাদ চালাতে হবে দাঈকে। সাহিত্যে যথাসাধ্য স্থান দখল ক'রে ইসলামী মূল্যবোধ ও চরিত্রকে শিক্ষিত সমাজে পরিস্ফুটিত করতে হবে।

❁ দেওয়াল পত্রিকা, পোস্টার

কোন মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল-কলেজ, বহু ফ্ল্যাটবিশিষ্ট বসতবাড়ি ইত্যাদির আম জায়গায় ছোট আকারে পত্রিকা বা পোস্টার এঁটে দাওয়াতের কাজ করা যায়।

দাওয়াতের কাজ করা যায়। সেখানে অপেক্ষমাণ মানুষদের টাইম-পাশও হবে এবং সেই সাথে কিছু ইসলামী জ্ঞানও লাভ হবে। বিশেষ ক'রে আদালত ও বিচার, যুলুম ও মিথ্যাবাদিতা ইত্যাদি বিষয়ক ইসলামী প্রচার-পত্র সেখানে থাকা বাঞ্ছনীয়।

❁ রেজিস্ট্রি অফিস

এ অফিসেও বহু অপেক্ষমাণ মানুষ অযথা সময় নষ্ট করে। সুতরাং এখানেও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকলে অবশ্যই দাওয়াতের বড় কাজ হবে। বিশেষ ক'রে জমি-জায়গা, জুলুম-জবরদখল প্রভৃতি সংক্রান্ত ইসলামী প্রচার-পত্র থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় অনেক মানুষ হিদায়াত পেতে পারে।

❁ সেলুন

মুসলিমের সেলুনেও অনেক সময় অনেক মানুষ অপেক্ষায় থাকে। সেখানেও কিছু বই-পত্রিকা রেখে তাদের সময়কে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা যায়।

❁ হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারি

একজন ডাক্তার পারেন তাঁর চিকিৎসার মাধ্যমে দাওয়াত দিতে। পাঁচবার নিয়মিত মুখ-চোখ ইত্যাদি ধোওয়া, ব্যায়াম-চর্চা করা, নিয়মিত উপবাস করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে পাঁচ-ওয়াক্ত নামায ও যথাসময়ে রোযা রাখার দাওয়াত খুব যুক্তিযুক্তভাবে দিতে পারেন। এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা মোল্লা-মৌলবীদের কথা মেনে নিতে চায় না, পক্ষান্তরে একজন ডাক্তার-মাস্টারের কথা খুব সহজে মেনে নেয়। সুতরাং তাদের পক্ষে উক্ত দাওয়াত বড়ই ফলপ্রসূ।

পরন্তু হাসপাতাল বা ডাক্তারখানায় লোকের সমাগম থাকে। অতএব সেখানে ইসলামী প্রচার-পত্রের বুক-শেল্ফ্ রাখা খুব উপকারী।

❁ কারখানা

শ্রমিকদের সমাবেশ যেখানে ঘটে, যেখানে তাদেরকে কোন কার্যক্ষেত্রে অপেক্ষা করতে হয়, সেখানেও ইসলামী প্রচার-পত্র রেখে দাওয়াতের কাজ করা যায়।

❁ হোটেল, চায়ের দোকান

হোটেল ও চায়ের দোকানে সাধারণতঃ টিভি চালিয়ে, খবরের কাগজ রেখে খদ্দের আকর্ষণ করা হয়। একজন খাঁটি মুসলিম তার হোটেল বা চায়ের দোকানে ইসলামী ভিডিও-অডিও চালিয়ে ও ইসলামী পত্র-পত্রিকা রেখে মুসলিম খদ্দের আকর্ষণ করতে পারে।

❁ বিবাহ অনুষ্ঠান

❁ মোবাইল

মোবাইলের মাধ্যমে এস-এম-এস ম্যাসেজ পাঠিয়ে দ্বীনের বহু কাজ ও পথনির্দেশনা করা যায়।

দাওয়াতের কার্যালয় হিসাবে নির্দিষ্ট কোন ক্ষেত্র নেই। যেখানেই মানুষের সমাগম, সেখানেই দাওয়াতের কাজ করতে হবে। যেখানেই পাপকাজ, সেখানেই তাতে যথানিয়মে বাধা দিতে হবে।

❁ মসজিদ

প্রত্যেক মুসলিমের জন্য মসজিদে উপস্থিতি জরুরী। তাই মসজিদ হল দাওয়াতের প্রধান কার্যালয়।

❁ মাদ্রাসা

মাদ্রাসা হল দাঈ প্রস্তুত করার কারখানা। ছাত্রদের মাঝে দাওয়াতের সঠিক পদ্ধতি শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। সিলেবাসের সীমাবদ্ধ শিক্ষা ছাড়াও বিশেষ তরবিয়তী কোর্সও রাখতে হয়। যাতে বক্তৃতা, লেখনী, তর্কালোচনা প্রভৃতি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু থাকে।

❁ স্কুল-কলেজ

এটিও দাওয়াতের বড় ময়দান। ভাল ছাত্রদের মাধ্যমে অন্যান্য ছাত্রদের কাছে দাওয়াতী বই-পত্র ইত্যাদি পৌঁছে দিয়ে দাওয়াতের কাজ করা যায়। অবশ্য মুসলিম-নিয়ন্ত্রিত হলে সেখানে মাঝে-মধ্যে বিশেষ দাওয়াতী প্রোগ্রামও করা যায়। তবে নবী-দিবস ইত্যাদি বিদআতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দাওয়াতী প্রোগ্রাম করতে গিয়ে বিদআতকে এক প্রকার সমর্থন করা বৈধ নয়।

❁ ইসলামী লাইব্রেরী

মসজিদে, মাদ্রাসায়, স্কুলে, ক্লাবে, বাড়িতে বড় অথবা ছোট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ক'রে দাওয়াতের কাজ করা যায়। সে লাইব্রেরীতে বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ভিডিও-অডিও ক্যাসেট, সিডি ইত্যাদি সাময়িক ধার স্বরূপ দিয়ে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

❁ ক্লাব

মুসলিম যুবকদের ক্লাব সাধারণতঃ অবৈধ খেলা ইত্যাদি থেকে পবিত্র হয়। তাই সেখানেও দাওয়াতের নানা প্রোগ্রাম রাখা যায়। তাছাড়া মুসলিমদের 'কিলাব'-ঘরকে সত্যিপক্ষে যুবশক্তির 'ক্লাব'ঘর তৈরি করতে দাঈদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত।

❁ কোর্ট

কোর্টে বহু লোকের সমাগম হয়, বহু লোককে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষাও করতে হয়। সুতরাং সেখানে ইসলামী বই-পুস্তকের বুক-শেল্ফ্ রেখে

বা ক্যাসেট বিতরণ ক'রে তার ভিতর থেকে প্রশ্নমালা প্রস্তুত ক'রে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা দাওয়াতের কাজে বড় উপকারী।

বলা বাহুল্য, যখন যে স্থানে যে বৈধ অসীলা দিয়ে দাওয়াতের কাজ সুবিধা হয়, তখন সেই স্থানে সেই অসীলা দিয়ে যথারীতি দাওয়াতের কাজ বাঞ্ছনীয়।

আবেগময় বয়ান

সত্য সূর্যবৎ স্পষ্ট। জ্ঞানী মানুষ সত্যের কথা শুনলে আকৃষ্ট হয়ে তা গ্রহণ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও কিছু মানুষ আছে, যারা কথায় রঙ পছন্দ করে। ভাল কথা রঙ লাগিয়ে না বললে তাদের মনে স্থান পায় না। তারা সত্য দেখে চিনে তা গ্রহণ করে না, বরং বক্তার বক্তৃতার চমক দেখে তা গ্রহণ করে। আর এই শ্রেণীর লোকেই রঙিন বাতিলের খপ্পরে পড়ে। সুতরাং তাদের মন আকৃষ্ট করতে আবেগময় বয়ান চাই। আবেগময় বয়ান করতে পারলেই এই শ্রেণীর মানুষের মন আকৃষ্ট হয়।

মানুষের মনও যত মানুষ তত প্রকার। আমি অনেক জায়গায় বক্তৃতা করি। অনেকে পছন্দ করে, অনেকে করে না। কেউ বলে, 'আপনার লেখা ও বক্তৃতা উভয়ই ভাল।'

কেউ বলে, 'আপনার লেখা ভাল, কিন্তু বক্তৃতা বেশ জোশালো-রসালো নয়।'

কেউ বলে, 'আপনার লেখা ও বক্তৃতায় (রাজনৈতিক বা জিহাদী) আন্দোলন নেই।'

আমি বলি, 'বলা বা লেখার তওফীক আল্লাহই দেন। যেমন তওফীক পাই, তেমনি বলি ও লিখি। যার যেমন মন, তেমন পসন্দ। হিদায়াতের মালিক আল্লাহ। আল্লাহ যার মঙ্গল চাইবেন, সে আমার লেখা বা বক্তৃতা দ্বারা উপকৃত হবে।'

অবশ্যই আবেগময় বয়ান এক শ্রেণীর প্রতিভা। মহান আল্লাহ যাকে চান, তাকে তা দান করেন। মহান আল্লাহই যাবতীয় বয়ান শিখিয়ে থাকেন। তিনি বলেছেন,

( ) { ( ) ( ) ( ) }

অর্থাৎ, অনন্ত করুণাময় (আল্লাহ); তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন বয়ান (ভাব প্রকাশ করতে)। *(সূরা রাহমান ঃ ১-৪)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় কিছু বয়ান যাদুর মতো।" *(বুখারী-মুসলিম)*

বিবাহ অনুষ্ঠানে বিবাহ ও দাম্পত্য বিষয়ক প্রচার-পত্র বিতরণ ক'রে দাওয়াতের কাজ নেওয়া যেতে পারে।

❁ কবরস্থান

কবরস্থানে লাশ দাফনের কাজে দেরী থাকলে সেখানেও দাঈ শেষ জীবন ও পরপারের কথা বলে শোকাহত মানুষকে উপদেশ দিতে পারে।

❁ জেলখানা

জেলখানা সাধারণতঃ অপরাধীদের বাসস্থান। সুতরাং সেখানে নানা অপরাধ বিষয়ক ইসলামী প্রচার-পত্র রেখে, বন্দীদেরকে সমবেত ক'রে নসীহত ক'রে, তাদেরকে তওবাহ করতে উদ্বুদ্ধ ক'রে, নিরপরাধ বন্দীদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে দাওয়াতের কাজ নেওয়া যেতে পারে।

❁ স্টেশন

বাস ও রেল-ওয়ে স্টেশনের প্রতীক্ষালয়ে বহু মানুষ অযথা সময় নষ্ট করে। সেখানেও ইসলামী প্রচার-পত্র রেখে দাওয়াতের কাজ নেওয়া যায়।

❁ শিক্ষা-শিবির

ছুটির দিনে অথবা অবসর সময়ে কোন এক জায়গায় বিষয়-ভিত্তিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার আকর্ষণ রেখে মানুষকে আহূত করা দোষের নয়।

❁ উপহার

বিভিন্ন উপলক্ষ্যে উপহার দেওয়ার মাধ্যমেও দাওয়াতের কাজ করা যায়।

বিবাহের ভোজ খেতে গিয়ে, জামাই বা বধূ দর্শন করতে গিয়ে বিবাহ ও দাম্পত্য এবং পরিবার ও পরিবেশ বিষয়ক বই-পুস্তক উপহার সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। অনুরূপ রোগী দর্শন, নবজাত শিশু দর্শন, ঈদ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে উপহারের সাথে ইসলামী বই যোগ করা দাওয়াতের কাজে বড় উপকারী।

❁ দান-অনুদান

বদান্য মানুষ দানের মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করতে পারে। দান করলে দাতার কাছে মানুষ ছোট হয়, উপকার করলে উপকারীর প্রতি মানুষ সহানুভূতিশীল হয়, আর সেটাই কাজে লাগে আল্লাহর ওয়াস্তে দ্বীনের দাওয়াতে।

❁ ভাড়া গাড়ি

একজন ড্রাইভার গাড়িতে দ্বীনী ক্যাসেট লাগিয়ে দ্বীনের দাঈ হতে পারে। কে জানে কোন্ কথায় আল্লাহ কাকে হিদায়াত দান করেন?

❁ প্রতিযোগিতা

বিজয়ীদেরকে মূল্যবান পুরস্কার দান করার কথা ঘোষণা ক'রে কোন বই

অর্থাৎ, কিছু বয়ান এমন আছে, যাতে যাদুর মতো তাছীর আছে। কিছু মানুষ সে বয়ান শুনে মন্ত্রমুগ্ধ ও অভিভূত হয়। আবেগমথিত বয়ান মানুষের মনে-প্রাণে আবেগ সৃষ্টি করে। সে বয়ান শুনে অনেকে মরতেও প্রস্তুত হয়ে যায়।

অবশ্য বয়ানে কয়েকটি জিনিস খেয়াল রাখা জরুরী ঃ-

- যয়ীফ বা জাল হাদীস বয়ান করা যাবে না।
- বয়ানে অতিরঞ্জন করা যাবে না।
- না জেনে কোন মাসআলা বয়ান করা যাবে না।

এমনভাবে বয়ান করা যাবে না, যেমনভাবে শরীয়তে নিষেধ এসেছে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, “আমি আমার উম্মতের উপর মুখের (জিভের) জ্ঞানী বা পণ্ডিত বাগ্মী মুনাফেকদেরকে অধিক ভয় করি।” *(মুসনাদে আহমদ ১/২২,৪৪)*

“অবশ্যই আল্লাহ এমন বাক্পটু মানুষকে ঘৃণা করেন, যে জিহ্বা দ্বারা ভক্ষণ করে (এমন ঢঙে জিভ ঘুরিয়ে কথা বলে,) যেমন গাভী নিজ জিহ্বা দ্বারা সাপটে তৃণ ভক্ষণ করে।” *(আবূ দাঊদ, তিরিমিযী হাসান)*

মহানবী ﷺ বলেন,

.( )

“লজ্জাশীলতা ও মুখচোরামি ঈমানের দু'টি শাখা। আর মুখ খিস্তি করা ও বাক্পটু হওয়া মুনাফিকীর দু'টি শাখা।” *(আহমাদ, তিরমিযী)*

ইমাম তিরমিযী (রঃ) ‘বায়ান’ বা বাক্পটুতার ব্যাখ্যায় বলেন, ‘ঐ খতীব (বক্তা)দের মতো বেশি কথা বলা, যারা খুতবা দিতে গিয়ে (বক্তৃতা করতে গিয়ে) লম্বা-চওড়া কথা বলে এবং উচ্চাঙ্গের ভাষাশৈলি দেখাতে চায়। তাতে তারা মানুষের প্রশংসা করে, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই।’ *(তিরমিযী)*

‘ঢপ মেরে গপ’ করা দাঈ বক্তার উচিত নয়। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, “তিন ব্যক্তি গপ্প করে; আমীর (নেতা) অথবা আদিষ্ট অথবা অহংকারী ব্যক্তি।” *(সহীহুল জামে, মিশকাত)*

আম্র বিন যুরারাহ বলেন, “একদা আমি কেচ্ছা বলছিলাম। এমতাবস্থায় আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ আমার নিকট এসে বললেন, ‘হে আম্র! নিশ্চয় তুমি ভ্রষ্টতাময় বিদআত রচনা করেছ অথবা তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর সাহাবা অপেক্ষা অধিক সৎপথপ্রাপ্ত।’ অতঃপর আমি লোকেদেরকে দেখলাম, সকলেই আমার নিকট থেকে সরে পড়েছে এবং আমার ঐ স্থানে কেউ অবশিষ্ট নেই।” *(সহীহ তারগীব ও তরহীব ৫৯ নং)*

ইচ্ছাকৃতভাবে হাসানোর উদ্দেশ্যে বানিয়ে কথা বলা বক্তার উচিত নয়।

রসূল ﷺ বলেন, “দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির, যে মিথ্যা বলে লোকেদেরকে

হাসায়। দুর্ভোগ তার জন্য, দুর্ভোগ তার জন্য।” *(আবুদাউদ ৪৯৮৯নং, তিরমিযী, সহীহুল জামে' ৭০১৩)*

তিনি আরো বলেন, “শোনো! যে ব্যক্তি এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে লোকেদেরকে হাসাতে চায়, সে ব্যক্তি সম্ভবতঃ আকাশ হতে দূরবর্তী স্থানে নিপতিত হয়। শোনো! তোমাদের মধ্যে কোন মানুষ এমন কথা বলে; যার দ্বারা সে নিজ সঙ্গীদেরকে হাসাতে চায় সম্ভবতঃ তার দরুন আল্লাহ ঐ মানুষের উপর ক্রোধান্বিত হন এবং তাকে জাহান্নামে না দেওয়া পর্যন্ত সন্তুষ্ট হন না।” *(সহীহ তারগীব ২৮৭৭নং)*

খ্যাতিমান বক্তা তিনিই, যিনি মানুষকে নিমিষে হাসাতে পারেন এবং নিমিষেই কাঁদাতে পারেন। তবে অবশ্যই তাঁর উক্ত সকল কথার খেয়াল রাখা উচিত।

বয়ান যতই সুন্দর হোক, শ্রোতার শোনার যতই আগ্রহ থাক, তা নাতিদীর্ঘ ও প্রয়োজন-মাফিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আবূ ওয়ায়েল শাক্বীক্ব ইবনে সালামা হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ইবনে মাসঊদ ﷺ প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে আমাদেরকে নসীহত শুনাতেন। একটি লোক তাঁকে নিবেদন করল, ‘হে আবূ আব্দুর রহমান! আমার বাসনা এই যে, আপনি যদি আমাদেরকে প্রত্যেক দিন নসীহত শুনাতেন (তাহলে ভাল হত)।’ তিনি বললেন, ‘স্মরণ রাখবে, আমাকে এতে বাধা দিচ্ছে এই যে, আমি তোমাদেরকে বিরক্ত করতে অপছন্দ করি। আমি নসীহতের ব্যাপারে তোমাদের প্রতি ঠিক ঐভাবে লক্ষ্য রাখছি, যেভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিরক্ত হবার আশংকায় উক্ত বিষয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। (অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে বিশেষ প্রয়োজন মাফিক নসীহত শুনাতেন।)’ *(বুখারী-মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মানুষের (জুমআর) দীর্ঘ নামায ও তার সংক্ষিপ্ত খুতবা তার শরয়ী জ্ঞানের পরিচায়ক। অতএব তোমরা নামায লম্বা কর এবং খুতবা ছোট কর।” *(মুসলিম)*

দাওয়াতের সুযোগ গ্রহণ

যিনি দ্বীনের দাঈ হবেন, তিনি সর্বদাই দাওয়াতের চিন্তা মাথায় রাখবেন। যেহেতু দাওয়াতের কাজ নির্দিষ্ট কোন ডিউটি পালনের কাজ নয়। এ কাজ নিজস্ব ব্যক্তিগত কাজ।

সুতরাং বিভিন্ন উপলক্ষ্যকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করবেন দাঈ। যেমন রমযান, বিবাহ, জানাযা ইত্যাদি।

বিপদের সময়ে মানুষকে সান্ত্বনা ও সাহায্য দিতে গিয়ে দাওয়াতের ভাবনা মাথায় রাখবেন। মানুষের কল্যাণ-কামনায় সদা নিরত থাকবে তাঁর মন।

মহানবী ﷺ বলেন, "দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।" আমরা বললাম, 'কার জন্য?' তিনি বললেন, "আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলমানদের শাসকদের জন্য এবং সকল সাধারণ মুসলমানদের জন্য।" *(মুসলিম)*

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ ؓ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামায কায়েম করা, যাকাত দেওয়া ও সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করার উপর বায়আত করেছি। *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ক্ষুধার্ত মানুষের কাছেও দাওয়াতের কাজ করবেন দ্বীনের দাঈ। মুমূর্ষ রোগীর কাছেও দাওয়াতের কাজ চালিয়ে যাবেন।

আনাস ؓ বলেন, একজন ইহুদী কিশোর নবী ﷺ-এর খিদমত করত। সে পীড়িত হলে মহানবী ﷺ তাকে দেখা করতে এলেন এবং তার শিথানে বসে বললেন, "ইসলাম গ্রহণ কর (তুমি মুসলিম হয়ে যাও)।" তাঁর এই কথা শুনে সে তার পিতার দিকে (তার মত জানতে) দৃষ্টিপাত করল। তার পিতা তার নিকটেই বসে ছিল। সে বলল, 'আবুল কাসেমের কথা তুমি মেনে নাও। ফলে কিশোরটি মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর নবী ﷺ এই বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন, "সেই আল্লাহর সকল প্রশংসা, যিনি ওকে জাহান্নাম থেকে বাঁচিয়ে নিলেন।" তারপর কিশোরটি মারা গেলে তিনি সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, "তোমরা তোমাদের এক সাথীর উপর (জানাযার) নামায পড়।" *(বুখারী ১২৬৮-নং)*

যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" *(মুসলিম)*

দাঈর সংগ্রামী জীবনের সাধনা হবে মানুষের পারলৌকিক মুক্তি। সুতরাং নিজে কষ্টে থাকলেও দাওয়াতের কাজ বিস্মৃত হন না।

ইউসুফ ؑ বিনা দোষে জেলে গেলেন। জেলে কত রকমের কষ্ট! তা সত্ত্বেও তিনি দাওয়াতের কথা ভুলে যাননি। যেহেতু ফুলের সৌরভ সকল

স্থানেই বিতরিত হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ যেখানেই যায়, সেখানেই আলো ছড়ায়। মহান আল্লাহ তাঁর কথা আল-কুরআনে বলেছেন,

}

( )

( )

( )

( )

( )

( ) {

অর্থাৎ, তার সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি (আঙ্গুর) নিঙড়ে মদ তৈরী করছি' এবং অপরজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।' ইউসুফ বলল, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব, এ জ্ঞান আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন, তারই অন্তর্ভুক্ত। যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি। আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের দ্বীন অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু এমন কতকগুলি নামের উপাসনা করছ, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখে নিয়েছ। এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া

আর কারোই উপাসনা করবে না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। হে আমার কারাসঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করাবে এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।' *(ইউসুফঃ ৩৬-৪১)*

আর এ কথা বিদিত যে, ইসলামের একাধিক ইমাম জেলে বসে কত মানুষ তৈরি করেছেন, কত গ্রন্থ রচনা করেছেন!

সুতরাং দাঈর অন্তরে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে ঈর্ষা থাকবে সর্বস্থলে। হর্ষে-বিষাদে সর্বদা থাকবে মানুষের কল্যাণ-চিন্তা। তবেই না তিনি দায়িত্ববোধসম্পন্ন দ্বীনের দাঈ।

মহিলার দাওয়াত

মহিলা-মহলে মহিলা দাওয়াতের কাজ করতে পারে। যেহেতু মহিলা পুরুষের ইমামতি করতে পারে না, জুমআর খুতবাও দিতে পারে না।

অবশ্য নিজের বাড়ির মাহরাম পুরুষদের মাঝে তার দাওয়াতী কাজ চলবে। যেহেতু সেখানে সে মা। আর মায়ের মতো মা হলে তার কথার বড় তাছীর থাকবে।

মায়ের দেখে মেয়ে শিখবে, বউ শিখবে। প্রতিবেশী মেয়েরা শিখবে। সে যেখানে যাবে, সেখানেই দাওয়াতের কাজ করবে। বিয়ে-বাড়িতে গিয়ে শরীয়ত-বিরোধী কাজে বাধা দেবে। যেহেতু 'আমকালে ডোম রাজা, বিয়েকালে মেয়ে রাজা।' মহিলার কথা মেয়েদের মাঝে বড় আসর করবে।

অনুরূপ মরা-বাড়িতে গিয়েও দাওয়াতের কাজ করবে। আপত্তিকর শরীয়ত-বিরোধী কাজে বাধা দেবে।

প্রয়োজনে নিজ পাড়া, মহল্লা বা গ্রামের মহিলাদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে অথবা নিজ বাড়িতে অথবা অন্য কোন বাড়িতে মহিলাদেরকে সমবেত ক'রে দর্সের কাজ করতে পারে, যেখানে পুরুষদের প্রবেশ নিষেধ থাকবে।

মহিলা-বিষয়ক এমন মাসায়েল আছে, যে বিষয়ে প্রশ্ন করতে মহিলা মহিলাকে লজ্জা করবে না। সুতরাং সে ক্ষেত্রে মহিলার তবলীগ বড় ফলপ্রসূ হবে বলে সুনিশ্চিত।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) প্রমুখ স্বর্ণ-যুগের মহিলাগণ দাওয়াতের কাজ করতেন। তাঁরা পুরুষদেরকেও হাদীস বয়ান করতেন। তবে নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ ছিলেন প্রত্যেক মু'মিনের মা।

বর্তমানে কোন গায়র-মাহরাম মহিলা কারো আপন মা বা বোন তুল্য নয়। পাতানো মা বা বোন হয়ে কোন লাভ হবে না। কারণ তাতে কেউ কারো মাহরাম প্রমাণিত হবে না। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে দর্স ও সফরের ব্যাপারটা ভেবে দেখার বিষয়। মাহরাম ছাড়া যেন কোন মহিলা সফরে না যায়; হজ্জে নয়, দাওয়াতের কাজেও নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন পুরুষ যেন কোন বেগানা নারীর সঙ্গে তার সাথে এগানা পুরুষ ছাড়া অবশ্যই নির্জনতা অবলম্বন না করে। আর মাহরাম ব্যতিরেকে কোন নারী যেন সফর না করে।" এক ব্যক্তি আবেদন করল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার স্ত্রী হজ্জ পালন করতে বের হয়েছে। আর আমি অমুক অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি।' তিনি বললেন, "যাও, তুমি তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্জ কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহিলা প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল। সামান্য তাপে ফুলের মত ঝলসে যায়। তাই অনেকে দাওয়াতের কাজে 'সর্দার' বা 'বুড়ি'দের কথায় আঘাত খেয়ে মুষড়ে পড়ে এবং আর দাওয়াতের জন্য মুখ খুলে না। এমনকি আপত্তিকর কর্ম দেখেও কথার ভয়ে তাতে বাধা দেয় না। দাওয়াতের অনেকটাই পথ অগ্রসর হয়ে মাঝপথে হয়রান হয়ে বসে পড়ে।

মহিলাদের দাওয়াতে আরো যে সকল বাধা পড়ে, তা সাধারণতঃ নিম্নরূপ ঃ-

১। স্বামী-সন্তান ও সংসার

দাঈ মহিলা দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে যেন স্বামী-সন্তান ও সংসারের ব্যাপারে ত্রুটি ঘটিয়ে না ফেলে। নচেৎ সেই লোককে ধাক্কা দিয়ে দূরে ঠেলে 'হাজারে আসওয়াদ' চুমু দেওয়ার মতই হবে।

কোন মহিলা স্বামী কাছে থাকলে তার অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখতে পারে না, মসজিদে যেতে পারে না। যেহেতু স্বামীর সন্তুষ্টি তার কাছে বড় জিনিস। তেমনি দাওয়াতে কোথাও যাওয়ার ক্ষেত্রেও।

বলা বাহুল্য, স্বামী-সন্তান ও সংসারের সকল দায়িত্ব পালনের পর যদি সময় থাকে, তাহলে সে অবসর সময়ে দাওয়াতের কাজ করতে পারে।

২। ইল্‌মের স্বল্পতা

মহিলার জ্ঞান-শিক্ষার ব্যাপারটা আমাদের দেশে খুব সহজ নয়। সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণ জ্ঞান সঞ্চয় না ক'রে দাওয়াতের কাজে সাহস করতে পারে না।

৩। মানসিক দুর্বলতা ও হীনম্মন্যতা

অনেক মহিলার কাছে ইল্‌ম আছে, কিন্তু হিম্মত নেই। হাতিয়ার আছে, কিন্তু প্রয়োগ করার মতো সাহস নেই। ফলে সে দাওয়াতের পথে অগ্রসর হতে চায় না। এমন মহিলাকে তার পিতা অথবা স্বামী সহযোগিতা করলে

আর এ আদেশে নারী-পুরুষ উভয়ে সমান।

দাওয়াতের জন্য সংগঠন

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত আলেম ও দাঈর নির্দিষ্ট পরিচয়ের কোন রঙ নেই।

ইবনুল কাইয়্যেম (রঃ) অনুগত বান্দার লক্ষণ উল্লেখ ক'রে বলেন, 'সে কোন নির্দিষ্ট (দলীয়) নামের বাঁধনে নিজেকে বাঁধে না, কোন পরিকল্পনা বা প্রতীকের ফাঁদে সে ফাঁসে না, কোন নির্দিষ্ট নাম বা পরিচ্ছদে সে সুপরিচিত হয় না এবং মনগড়া কল্পিত পদ্ধতি ও নীতিও সে মানে না। বরং যখন সে জিজ্ঞাসিত হয় যে, 'তোমার গুরু কে?' তখন বলে, 'রসূল।' 'তোমার নীতি কী?' বলে, 'অনুসরণ।' 'তোমার পরিচ্ছদ কী?' বলে, 'সংযম (তাকওয়া)।' 'তোমার মযহাব কী?' বলে, '(কুরআন ও) সুন্নাহর প্রতিষ্ঠা।' 'তোমার উদ্দেশ্য কী?' বলে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টি।' 'তোমরা খানকাহ কোথায়?' বলে, 'মসজিদ।' 'তোমার বংশ কী?' বলে, 'ইসলাম।'

শায়খ বাকর আবু যায়দ তালেবে ইলমকে সম্বোধনপূর্বক অসিয়ত ক'রে বলেন, 'ইসলাম (আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ) ও সালাম (শান্তি) ছাড়া মুসলিমদের আর কোন নিদর্শন নেই। অতএব হে তালেব ইল্ম! আল্লাহ তোমার মধ্যে ও তোমার ইলমে বর্কত দান করুন। ইল্ম সন্ধান কর। আমল অন্বেষণ কর এবং আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান কর সলফের পথ ও পদ্ধতিমতে। কোন জামাআতে (দলে বা সংগঠনে) প্রবেশ করো না। তা করলে প্রশস্ততা থেকে তুমি সঙ্কীর্ণ খাঁচায় বন্ধ হয়ে যাবে। ইসলামের পুরোটাই তোমার জন্য চলার পথ ও জীবন-পদ্ধতি এবং সমগ্র মুসলিমরাই এক জামাআত। আর আল্লাহর হাত জামাআতের উপর। যেহেতু ইসলামে কোন দলাদলি নেই। আমি তোমার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি যে, তুমি যেন বিছিন্ন হয়ে বিভিন্ন বাতিল ফির্কা, জামাআত, মযহাব এবং অতিরঞ্জনকারী দলের মাঝে দৌড়ে না যাও, তার উপর তুমি তোমার সম্প্রীতি ও বিদ্বেষের বুনিয়াদ না রাখ। সুতরাং তুমি রাজপথের তালেবে ইল্ম হও, সুন্নাহর অনুসারী হও, সলফের (সাহাবাবৃন্দের) পদাঙ্কানুসরণ কর, সজ্ঞানে আল্লাহর পথে মানুষকে আহবান কর। মানীদের মান ও অগ্রগামিতা স্বীকার কর। জেনে রেখো, অভিনব গঠন ও গতিভিত্তিক দলাদলি---যা সলফের যুগে পরিচিত ছিল না---তা ইলমের পথে প্রধান প্রধান প্রতিবন্ধকসমূহের অন্যতম এবং জামাআত ছিন্নবিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ। যেহেতু এই দলাদলিই ইসলামী সংহতির রজ্জুকে কত ক্ষীণ ক'রে

হয়তো দাওয়াতের কাজে ফললাভ করা যেতে পারে।

৪। লজ্জাশীলতা ও সংকোচবোধ

মহিলা প্রকৃতিগতভাবে লজ্জাশীলা। বরং লজ্জাই নারীর ভূষণ এবং মু'মিনের ঈমানের অঙ্গ। কিন্তু অনেকে অতিরিক্ত লজ্জা ক'রে দাওয়াতের কাজে মুখ খুলতেও পিছিয়ে থাকে। এমন লজ্জা ঠিক নয়।

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'আনসারদের মহিলারা কত ভাল মহিলা! দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করতে তাদেরকে তাদের লজ্জা বাধা দেয় না।' *(আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

'সংকোচের বিহ্বলতায় নিজেরে অপমান, সংকটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ' কথাটি অনেক মহিলা পার্থিব শিক্ষা, চাকরি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে মেনে নিলেও দ্বীনী বিষয়ে মানতে চায় না। আসলে তা কিন্তু তা দ্বীনদারীতে এক প্রকার স্পষ্ট ত্রুটি। কারণ, যে দ্বীনদার হবে, দাওয়াতের কাজ তার দ্বীনদারীর একটি অঙ্গ হবে। যে মু'মিন হবে, দাওয়াতের কাজ তার ঈমানী দাবী হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

[:] {

অর্থাৎ, বিশ্বাসী পুরুষরা ও বিশ্বাসী নারীরা হচ্ছে পরস্পর একে অন্যের বন্ধু, তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে নিষেধ করে। *(তাওবাহঃ ৭১)*

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোন গর্হিত কাজ দেখবে, সে যেন তা নিজ হাত দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেয়। যদি (তাতে) ক্ষমতা না রাখে, তাহলে নিজ জিভ দ্বারা (উপদেশ দিয়ে পরিবর্তন করে)। যদি (তাতেও) সামর্থ্য না রাখে, তাহলে অন্তর দ্বারা (ঘৃণা করে)। আর এ হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমান।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন, তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত, তা করত না এবং তারা তা করত, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হত না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন, যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে সে মু'মিন এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা সংগ্রাম করবে সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম)*

ফেলেছে এবং এরই কারণে মুসলিম সমাজে কত বিপর্যয় সৃষ্টি হয়েছে! অতএব আল্লাহ তোমার প্রতি সদয় হন, তুমি বিভিন্ন দল ও ফির্কা থেকে সাবধান হও; যার চক্রান্ত ও দুরভিসন্ধি সুস্পষ্ট। এ সমস্ত দল তো গৃহছাদে সংযুক্ত পানি নিকাশের পাইপের মত; যা ঘোলা পানি সমূহকে (নিজের মধ্যে একত্রে) জমা করে এবং নিরর্থক বর্জন করে।

তবে হ্যাঁ, তোমার প্রতিপালক যার প্রতি করুণা করেছেন, ফলে সে নবী ﷺ ও তাঁর সাহাবাবৃন্দের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' *(তাসনীফুন্নাস)*

সুতরাং দাঈর উচিত, দলাদলির ছোবল থেকে দূরে থাকা। দলাদলি থেকে সেইরূপ দূরে পলায়ন করা, যেমন বাঘ দেখে দূরে পলায়ন করা হয়।

সত্যিকারের একজন আলেম হবেন উদার মনের, ভিতর-বাহির সমান পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের। পরন্তু কোন দলের কবলে পড়লে তাঁর হৃদয়ে বিদ্বেষ, রেষারেষি, খোঁটা-খোঁচা ও পরচর্চার নিরাপদ স্থান লাভ করবে। কারণ ফির্কাবন্দী ও দলাদলি স্বামী-স্ত্রীর মাঝেও বিচ্ছেদ ঘটায়।

দাঈ কোন নির্দিষ্ট দল বা জামাআতের হলে তিনি দাওয়াতের ময়দানে অনেক লোককে হারাবেন। নির্দিষ্ট নাম ও প্রতীক ব্যবহার ক'রে দাওয়াত দিলে অনেক মানুষ তাঁর নিকট থেকে দূরে সরে যাবেন। আহলে ইল্‌ম হলে তাঁর মূল্যবান ইল্‌ম থেকে বহু মুসলমান বঞ্চিত হয়ে যাবেন। অথচ তা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

মুসলিম উম্মাহর মধ্যে অনেক দল ও জামাআত সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীনকালে বহু ফির্কা প্রকাশ পেয়েছে, যেমন খাওয়ারিজ, মু'তাযিলা, জাহমিয়্যাহ, শিয়া প্রভৃতি। বর্তমান যুগেও বহু ফির্কা ও জামাআত নিজ নিজ সঠিকতার দাবী নিয়ে ময়দানে কাজ করছে। দাঈর উচিত, সে সকল ফির্কা ও জামাআতকে ডাইনে-বামে ফেলে রেখে সরল পথে সম্মুখ পানে অগ্রসর হওয়া।

হুযাইফাহ বিন য়্যামান বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ইষ্ট ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আর আমি ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কায় অনিষ্ট ও অমঙ্গল বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা মূর্খতা ও অমঙ্গলে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই মঙ্গল দান করলেন। কিন্তু এই মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আছে।" আমি বললাম, 'অতঃপর ঐ অমঙ্গলের পর আর মঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আর তা হবে ধোঁয়াটে।" (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মঙ্গল থাকবে না। বরং তার সাথে অমঙ্গল, বিঘ্ন, মতানৈক্য এবং চিত্ত-বিকৃতির ধোঁয়াটে পরিবেশ

থাকবে।) আমি বললাম, 'তার মধ্যে ধোঁয়াটা কি?' তিনি বললেন, "এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ছাড়া অন্যের সুন্নাহ (তরীকা) অনুসরণ করবে এবং আমার হেদায়াত (পথনির্দেশ) ছাড়াই (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করবে। যাদের কিছু কাজকে চিনতে পারবে (ও ভালো জানবে) এবং কিছু কাজকে অদ্ভূত (ও মন্দ) জানবে।" আমি বললাম, 'ঐ মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সে যুগে) জাহান্নামের দরজাসমূহে দন্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম, 'আমাকে কি আদেশ করেন -যদি আমি সে সময় পাই?' তিনি বললেন, "মুসলিমদের জামাআত ও ইমাম (নেতা)র পক্ষাবলম্বন করবে।" আমি বললাম, 'কিন্তু যদি ওদের জামাআত ও ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, "ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৮-২নং)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ বলেন, একদা রসূল ﷺ স্বহস্তে একটি (সরল) রেখা টানলেন, অতঃপর বললেন, "এটা আল্লাহর সরল পথ।" তারপর ঐ রেখাটির ডানে ও বামে আরো অনেক রেখা টেনে বললেন, "এই হচ্ছে বিভিন্ন পথ; যার প্রত্যেকটির উপর রয়েছে শয়তান, যে ঐ পথের দিকে আহ্বান করে (দাওয়াত দিতে) থাকে।" অতঃপর তিনি এই আয়াতটি পাঠ করলেন ঃ-

}

( ) {

অর্থাৎ, নিশ্চয় এটিই আমার সরল পথ, সুতরাং এরই অনুসরণ কর ও বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে। এভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দান করেছেন যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত, আহমাদ, হাকেম, মিশকাত ১/৫৯)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিস্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামী হবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত

আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।” *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

ইরবায বিন সারিয়াহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “তোমাদের মধ্যে যে আমার পরে জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। অতএব তোমরা আমার সুন্নাহ (পথ ও আদর্শ) এবং আমার পরবর্তী সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাহ অবলম্বন করো। তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, দাঁতে কামড়ে ধরো। আর দ্বীনে নবরচিত কর্ম থেকে সাবধান থেকো। কারণ প্রত্যেক নবরচিত (দ্বীনী) কর্মই হল ‘বিদআত’। আর প্রত্যেক বিদআতই হল ভ্রষ্টতা।” *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪৬০৭, তিরমিযী ২৮-১৫ নং, ইবনে মাজাহ, মিশকাত ১৬৫নং)*

বলা বাহুল্য, উপর্যুক্ত হাদীসসমূহে ‘সিরাত্বে মুস্তাক্বীম’ তথা সাহাবা ও সলফে সালেহীনের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে এবং সেই সাথে নানা ফির্কা থেকে দূরে থাকতে তাকীদ করা হয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের উচিত, সেই রাজপথের পথিক হওয়া, যে পথ বড় উজ্জ্বল, যে পথের রাতটাও দিনের মতো।

সেই মেরুদণ্ডসম পথকেই সালাফিয়াত বলা হয়। যেহেতু সে পথের পথিকরা সলফ তথা সাহাবাগণের বুঝ অনুসারে কুরআন-হাদীস বুঝে। যাঁদের পথ অবলম্বন ছাড়া মুসলিম বেহেশ্তের পথ পেতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার নিকট সৎপথ প্রকাশ হওয়ার পর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং বিশ্বাসীদের পথ ভিন্ন অন্য পথ অনুসরণ করবে, তাকে আমি সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে সে ফিরে যেতে চায় এবং জাহান্নামে তাকে দগ্ধ করব। আর তা কত মন্দ আবাস! *(নিসাঃ ১১৫)*

এখানে জেনে রাখা ভাল যে, সালাফিয়াত কোন মযহাব বা ফির্কার নাম নয়। এ হল প্রকৃত ও আসল ইসলামের নাম। মুসলিমদের নানা মত ও নানা পথ হওয়ার সময় যে ব্যক্তি সলফদের মত ও পথ অবলম্বন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত ও আসল মুসলিম।

পক্ষান্তরে যদি কেউ জানতে চায় যে, সালাফীদের নেতা কে? তাহলে তার জেনে রাখা উচিত যে, সাহাবাদের নেতা শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। আর সে যদি তাঁদের পথ ধরে চলে, তাহলে সেও সালাফী, অর্থাৎ সেই আসল মুসলিম।

তাঁরা এবং তাঁর অনুসারীরাই হল (হাদীসে বর্ণিত) ‘জামাআত’। তাঁরাই হলেন নানা ‘আহলে বিদআহ ও ফুরক্বাহ’র মাঝে ‘আহলে সুন্নাহ

অলজামাআহ’।

তাঁরাই হলেন ‘জামাআতুল মুসলিমীন’। নানা আক্বেলপন্থীদের মাঝে তাঁরাই হলেন সুন্নাহ বা হাদীসপন্থী। তাঁদেরকেই ‘আহলে সুন্নাহ বা হাদীস বা আষার’ বলা হয়। যেহেতু অন্যেরা যখন আক্বেল থেকে দলীল দেয়, তখন তাঁরা সুন্নাহ ও হাদীস থেকে দলীল পেশ করেন। অন্যেরা যখন অন্যের ‘সুন্নাহ’ (তরীকা)কে অবলম্বন করে, তাঁরা তখন নবীর ‘সুন্নাহ’ ও তরীকাকে অবলম্বন করেন। অন্যেরা মতভেদের সময় যখন ‘অমুক-তমুক’-এর পক্ষাবলম্বন করেন, তাঁরা তখন নবী ও তাঁর সাহাবার পক্ষাবলম্বন করেন।

কোন মতভেদের সময় যখন অন্যেরা ‘অমুক-তমুক’-এর পক্ষপাতিত্ব করে, তখন তাঁরা কেবল কিতাব ও সুন্নাহর পক্ষপাতিত্ব করেন।

মতভেদ তো হতেই পারে, তা বলে কি তার ফায়সালা নেই? অবশ্যই আছে। অন্যেরা অন্যের ফায়সালা মানে, আর তাঁরা মানেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ফায়সালা। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

}

( ) {

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(নিসাঃ ৫৯)*

তাঁরাই হলেন জামাআত। এক রাষ্ট্রে একই নেতার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ জামাআত। অথবা নবী ও সাহাবার পথের অনুগামী জামাআত, চাহে তার সংখ্যা কম হোক বা বেশি। যেহেতু অনুগামীদের সংখ্যাধিক্য হকের দলীল নয়। সংখ্যায় কম হলেও কষ্টিপাথরে যারা হকপন্থী, তারাই হকপন্থী। আর হকপন্থীর সংখ্যা কমই হয়ে থাকে; যেমন কুরআন-হাদীসে সে কথার বহু প্রমাণ রয়েছে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, ‘হকের অনুসারীই হল জামাআত; যদিও তুমি একা হও।’ *(ইবনে আসাকের, মিশকাত ১/৬১ টীকা নং ৫)*

সেই জামাআতই হল ‘ফির্কাহ নাজিয়াহ ও ত্বায়েফাহ মানসূরাহ’। এই দলের ব্যাপারেই প্রিয় নবী ﷺ বলেছেন, “সর্বকালে আমার উম্মতের একটি দল হকের সাথে বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা উপেক্ষা করবে তারা

তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত) এসে উপস্থিত হবে।” *(মুসলিম)*

ইসলামের প্রকৃত অনুসারীদেরকে যে যে উপাধি দিয়ে ভূষিত করা হয়েছে, তা কিন্তু কোন স্থান-কাল-পাত্রের সাথে নির্দিষ্ট নয়। যেহেতু ইসলামের ফজর থেকে নিয়ে কিয়ামত আসার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই জামাআত অবশিষ্ট আছে ও থাকবে।

উক্ত উপনামে ইসলামের সকল দিক শামিলও আছে। আক্বীদা, আহকাম, আখলাক, মাসায়েল, ফাযায়েল, জিহাদ, অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সব কিছু। কোন এক বা একাধিক দিক ছেড়ে অন্য একটা দিক নিয়ে সে দল পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হয় না। কেবল তাবলীগ নিয়ে, অথবা কেবল জিহাদ নিয়ে, অথবা কেবল ইসলামী রাষ্ট্রগঠন নিয়ে এক এক প্রবণতায় এক এক দলে ও জামাআতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় না। কোন শির্ক-বিদআত নিয়ে তো নয়ই, কোন ব্যক্তি বিশেষের মত নিয়েও কোন দল বা জামাআত সৃষ্টি করে না।

‘বর্তমানে দলে দলে বিভক্ত হওয়ার দৃশ্য আমাদের সামনেই রয়েছে। কুরআন ও হাদীস বোঝার এবং তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ নিয়ে পারস্পরিক কিছু মতপার্থক্য থাকলেও তা কিন্তু দলে দলে বিভক্ত হওয়ার কারণ নয়। এ ধরনের বিরোধ তো সাহাবী ও তাবেঈনদের যুগেও ছিল, কিন্তু তাঁরা ফির্কাবন্দী সৃষ্টি করেননি এবং দলে দলে বিভক্ত হয়েও যাননি। কারণ, তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও সকলের আনুগত্য ও আক্বীদার মূল কেন্দ্র ছিল একটাই। আর তা হল, কুরআন এবং হাদীসে রসূল ﷺ। কিন্তু যখন ব্যক্তিত্বের নামে চিন্তা ও গবেষণা কেন্দ্রের আবির্ভাব ঘটল, তখন আনুগত্য ও আক্বীদার মূল কেন্দ্র পরিবর্তন হয়ে গেল। আপন আপন (ভক্তিভাজন) ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের উক্তি ও মন্তব্যসমূহ প্রথম স্থান দখল করল এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উক্তিসমূহ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হল। আর এখান থেকেই মুসলিম উম্মাহর মাঝে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা শুরু হল; যা দিনে দিনে বাড়তেই লাগল এবং বড় শক্তভাবে বদ্ধমূল হয়ে গেল।’ *(আহসানুল বায়ান ৯৩পৃঃ)*

মুসলিমদের এই জামাআত ইসলামের স্বর্ণযুগে কেবল ‘মুসলিম’ বলেই পরিচিত ছিল। আল্লাহর নবী ﷺ-এর যুগে কোন দলাদলি ছিল না। বরং তিনি এই শ্রেণীর দলাদলির বিভক্তিকে অপছন্দ করতেন। বানী মুস্তালাক্ব যুদ্ধে এক আনসারী ও এক মুহাজিরীর মধ্যে কোন কলহ বাধলে আনসারী আনসারের নাম ধরে এবং মুহাজিরী মুহাজিরীনের নাম ধরে আহবান করলেন। তা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, “জাহেলিয়াতের আহবান? অথচ আমি তোমাদের মাঝে রয়েছি! তা বর্জন কর, কারণ তা পচা (দুর্গন্ধময়)।” *(তিরমিযী ৩৩১৫নং)*

নববী যুগ ছিল অন্ধ পক্ষপাতিত্ব বর্জিত। তখন কোন দলাদলি বা ফির্কা-মযহাব ছিল না। মুনাফিক ছাড়া সকল মুসলিমগণ এক জামাআতের ছিলেন।

মহানবী ﷺ জামাআতবদ্ধভাবে বাস করার তাকীদও দিয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, “তোমরা জামাআতবদ্ধভাবে বাস কর এবং বিচ্ছিন্নতা থেকে সাবধান থেকো। সুতরাং যে জান্নাতের মধ্যস্থল পেতে চায়, সে যেন জামাআতের সাথে থাকে।” *(কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৭নং)*

“জামাআত (ঐক্য) হল রহমত এবং বিচ্ছিন্নতা হল আযাব।” *(মুসনাদে আহমাদ, কিতাবুস সুন্নাহ, শায়বানী ৮৯৫, সহীহুল জামে’ ৩১০৯নং)*

“যে ব্যক্তি আনুগত্য করা থেকে হাত গুটিয়ে নিল, সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার জন্য কোন প্রমাণ থাকবে না। আর যে ব্যক্তি বায়আত না করে মৃত্যুবরণ করল, সে জাহেলিয়াতের মরা মরল।”

এর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, “যে ব্যক্তি জামাআত ত্যাগ ক’রে মারা গেল, সে জাহেলিয়াতের মৃত্যু বরণ করল।” *(মুসলিম)*

“যে কোন গ্রাম বা মরু-অঞ্চলে তিনজন লোক বাস করলে এবং সেখানে (জামাআতে) নামায কায়েম না করা হলে শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার ক’রে ফেলে। সুতরাং তোমরা জামাআতবদ্ধ হও। অন্যথা ছাগ পালের মধ্য হতে নেকড়ে সেই ছাগলটিকে ধরে খায়, যেটি (পাল থেকে) দূরে দূরে থাকে।” *(আবু দাঊদ-হাসান সূত্রে)*

বর্ণনাকারী সায়েব বলেন, ‘এখানে জামাআত বলতে উদ্দেশ্য নামাযের জামাআত।’ আর তার প্রমাণ হাদীসের প্রথমাংশ।

“জামাআতের উপর আল্লাহর হাত থাকে। সুতরাং যে (জামাআত থেকে) পৃথক হবে, সে পৃথক হয়ে জাহান্নামে যাবে।” *(তিরমিযী)*

“আমার (অন্তর্ধানের) পরে অনেক কিছু (আপত্তিকর ঘটনা) ঘটবে। সুতরাং যাকে জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেখবে অথবা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়্যাহর ঐক্যকে নষ্ট করতে দেখবে, তাকে হত্যা ক’রে ফেলো, তাতে সে যেই হোক না কেন।” *(মুসলিম)*

নচেৎ বুঝতেই তো পারছেন, যে কোন সংগঠনের সাথে যুক্ত নয়, সে হত্যাযোগ্য নয়। বরং এ হাদীসে স্পষ্টভাবে দলাদলি ও ঐক্যবদ্ধ জামাআতকে ভাগাভাগি করতে নিষেধ করা হয়েছে।

“তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করো না; যে জামাআত ত্যাগ করে নেতার অবাধ্য হয়ে মারা যায়, যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভু থেকে পলায়ন করে মারা যায়, এবং সেই নারী যার স্বামী অনুপস্থিত থাকলে---তার

সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বন্দোবস্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও---তার অনুপস্থিতিতে বেপর্দায় বাইরে যায়।” *(সিঃ সহীহাহ ৫৪২নং)*

“যে ব্যক্তি জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হল সে যেন ইসলামের রশিকে নিজ গলা হতে খুলে ফেলল। তবে যদি সে পুনরায় জামাআতে ফিরে আসে তবে ভিন্ন কথা।” *(আহমাদ, সহীহ তিরমিযী ২২৯৮, সহীহুল জামে' ১৭২৮নং)*

“তিনটি বিষয় এমন আছে, যাতে কোন মুসলিমের হৃদয় খিয়ানত করতে পারে না। (এক) নির্ভেজালভাবে আল্লাহর জন্য আমল করা। (দুই) সাধারণ মুসলিমদের জন্য কল্যাণ কামনা করা। (তিন) মুসলিমদের জামাআতকে আঁকড়ে ধরে থাকা। কেননা, তাঁদের (ঐক্যবদ্ধতার) আহবান তাঁদের সকলকে পরিবেষ্টন করে রাখে।” *(মিশকাত, তাহক্বীক্ব সহ হাদীস নং২২৮)*

উমার ؓ বলেছেন, ‘জামাআত ছাড়া ইসলাম নেই। নেতৃত্ব ছাড়া জামাআত নেই। আর আনুগত্য ছাড়া নেতৃত্ব নেই।’ *(দারেমী ২৫১নং)*

বুঝতেই পারছেন যে, উক্ত নির্দেশাবলিতে ‘জামাআত’ বলতে কোন সংগঠন, জামাআত বা দল নয়। আর বায়আত বলতে রাষ্ট্রনেতার হাতে আনুগত্যের বায়আত। সুতরাং উক্ত বাণীসমূহকে সংগঠন অর্থে ব্যবহার ক'রে ইসলামের মাঝে দল তৈরি করা অবশ্যই বৈধ নয়। যেমন জান-মাল দিয়ে জিহাদ করার আয়াত ও হাদীসসমূহকে তাবলীগের অর্থে সীমাবদ্ধ করা উচিত নয়, যদিও তাবলীগ এক প্রকার জিহাদ এবং জিহাদে তাবলীগ আছে।

জ্ঞাতব্য যে, কোন দল বা ফির্কা সৃষ্টি না ক'রে কিছু লোকের দাওয়াতের কাজ জামাআতবদ্ধভাবে করা আপত্তিকর নয়। যেমন সফরে একাধিক লোক গেলে জামাআত ও আমীর এবং মসজিদে-মসজিদে জামাআত ও ইমাম উক্ত হাদীসসমূহের পরিপন্থী নয়।

সমাপ্ত